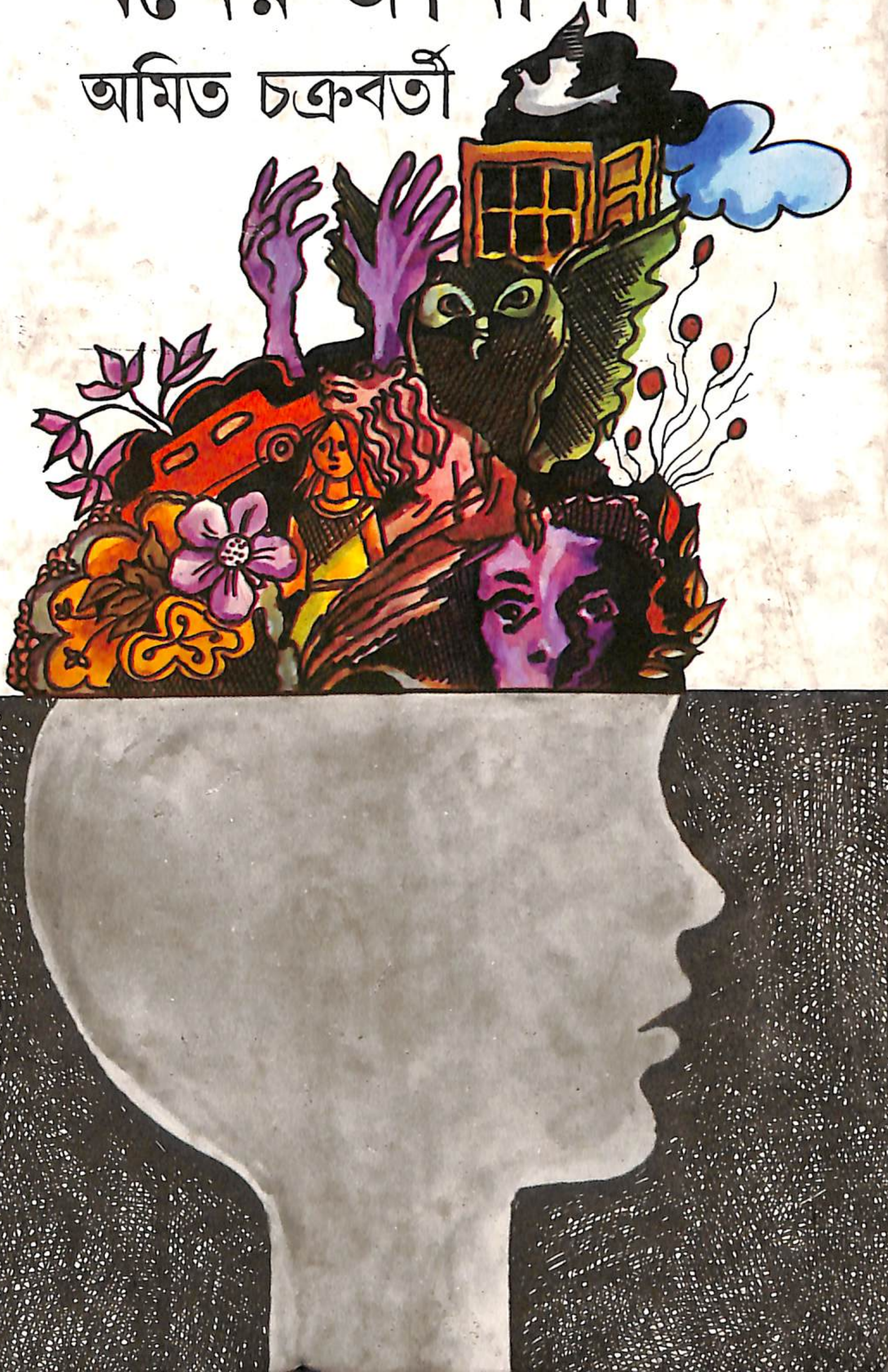
মনের জানালা

অমিত চক্রবর্তী



মনের জানালা

(কিশোরদের উপযোগী মনোবিজ্ঞানের বই)

অমিত চক্রবর্তী

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

Maner Janala
(A book on popular Pschology)
By
Dr. Amit Chakraborty

প্রকাশক :
শ্রী সুধীরকুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৬

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি : দেবব্রত চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত

মূল্য : ১২ টাকা

মুদ্রাকর
প্রিণ্ট-ও-গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭৩

ফটোটাইপ সেটিং :
প্রতিক্ষণ প্রাইভেট লিমিটেড
৭, জহরলাল নেহেরু রোড
কলিকাতা-১৩

মনোবিজ্ঞানের নানা বিষয়ে অসংখ্য কৌতুহল মিটিয়েছেন যিনি—আমার সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড· দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় (দেবুদা)-এর হাতে এ বই তুলে দিলাম ।

এই লেখকের

টমটম থেকে ইনস্যাট
সাত সমুদ্র
হ্যালো হ্যালী !
নিজের বুদ্ধি যাচাই কর
দু'হাজার তেরো
(বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প সংকলন)

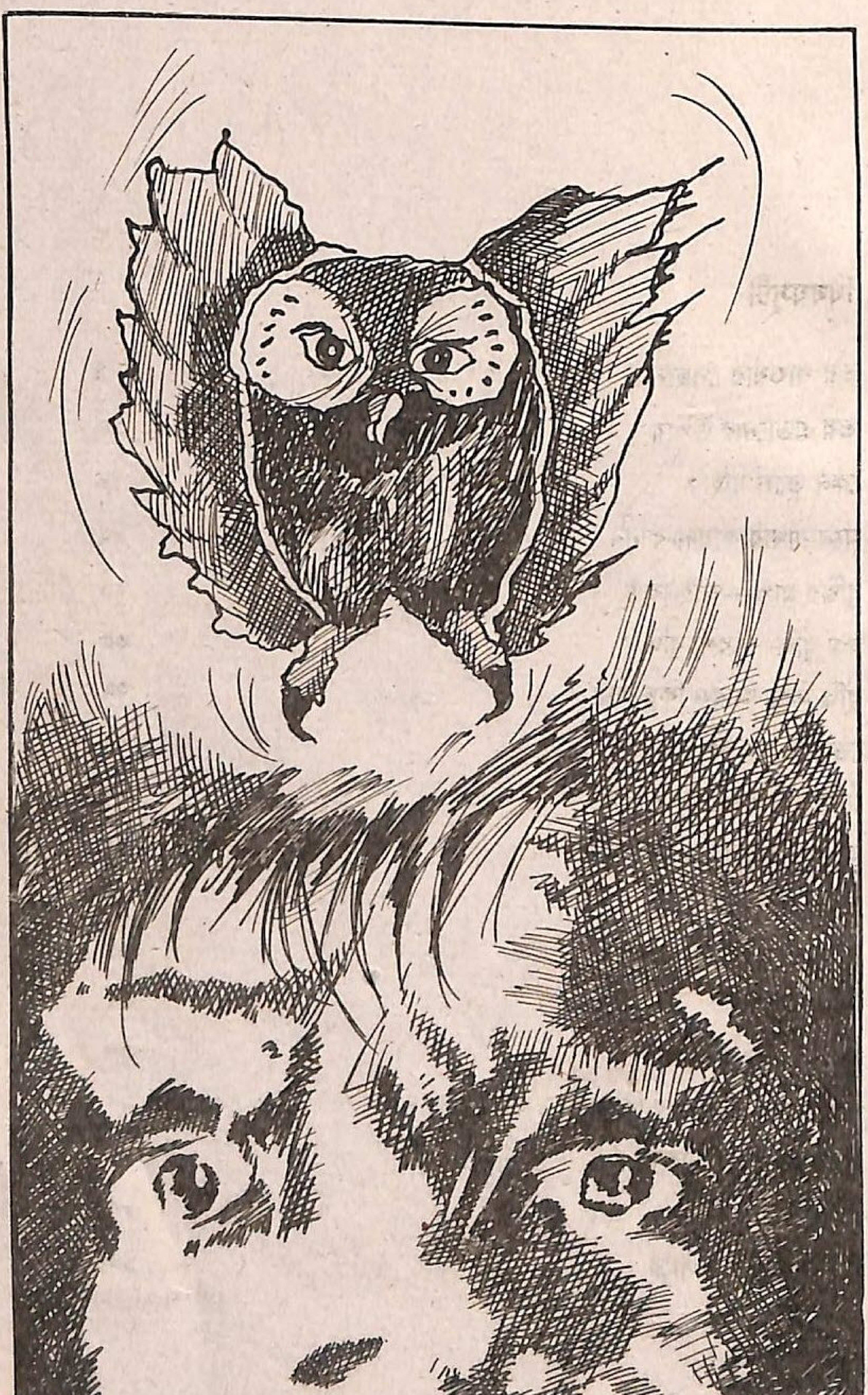
মুখবন্ধ

কে না জানে—বিজ্ঞানের যেসব শাখায় আজ নিয়মিত পঠন-পাঠন-গবেষণা চলে তার মধ্যে উপেক্ষিত যে বিষয়গুলি রয়েছে তাদের যদি একটা তালিকা বানানো হয় তবে তার গোড়াতেই থাকবে 'মনোবিজ্ঞানে'র নাম। বিজ্ঞানের এই শাখাটি নিয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে থাকে (তাদের সংখ্যা অবশ্যই খুব সীমিত), মনোবিজ্ঞানের প্রতি তাদের মনে যে বাড়তি কোনও আকর্ষণ জাগে না তার একটা বড় কারণ—বিষয়টি আজো পাঠ্যপুস্তকের অনাকর্ষণীয় গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞানের ওপর এযাবৎ কোনও জনপ্রিয় গ্রন্থ লেখা হয়েছে বলে জানা নেই। রোজকার জীবনে ভীড় করে আসা মনোবিজ্ঞানের টুকিটাকি বিষয়গুলিকে বাংলার কিশোর কিশোরীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বই-এর অন্তর্ভুক্ত লেখার প্রায় সবগুলোই ধারাবাহিকভাবে 'বিজ্ঞান মেলা' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল (জুন ১৯৮১ সংখ্যা থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যা পর্যন্ত)। পাঠ্য-পুস্তকগুলিতে যেভাবে মনোবিজ্ঞানের বিষয়গুলি পরপর সাজানো হয়—বলা বাহুল্য, সে রীতি এখানে অনুসৃত হয় নি। 'মনের জানালা' লেখার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য—ছোটদের মধ্যে বিজ্ঞানের এই নবীন শাখাটি সম্পর্কে আগ্রহ জাগানো। গল্পের ভঙ্গিতে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। এই বই পড়ে আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের নানা বিষয়ে 'আরো-জানা'র ইচ্ছেটা যদি জেগে ওঠে তবে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

অমিত চক্রবর্তী

বিষয়সূচী

ভয় পাওয়ার পেছনে···	৯
ভয় এড়ানোর উপায়	১৪
কেন ভুলে যাই ?	১৯
মনে রাখার কায়দা-কানুন	২২
বুদ্ধির মাপ—আই-কিউ	২৯
কম বুদ্ধি—বেশী বুদ্ধি !	৩৫
বুদ্ধি নিয়ে আরও কিছু কথা	৩৯
ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয় ?	৪৩
মনগড়া সব ব্যাপারস্যাপার	৪৭
আবেগ-অনুভূতির চাবিকাঠি	৫১
শরীর মনের আঁতাত	৫৭
ইচ্ছের জোরে কি না হয় !	৬১
চিন্তার ছাপ	৬৭
নতুন চিন্তার পেছনে···	৭০
পরিবেশের হেরফেরে কি আচরণ বদলায় ?	৭৫
উদ্ভট সব চিন্তা-ভাবনা	৮১
আত্মহত্যার রহস্য	৮৫
মানসিক রোগও সারে	৯০



ভয় পাওয়ার পেছনে...

বাড়ী ফিরতে ফিরতে প্রায় সাতটা বেজে গেল। সরমাদি বসে আছেন পড়ার টেবিলে। অন্তুর খারাপ লাগছিল। আসলে খেলার শেষে বাড়ী ফেরার পথে মণ্টুদা হাবিজাবি কথা বলে দেরী না করিয়ে দিলে সন্ধ্যের আগেই বাড়ী পৌঁছে যেত অন্তু। মণ্টুদার কথাবার্তার ধরনধারনটাই কেমন বিচ্ছিরি।

—এই যে ভাল ছেলে, এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরছো যে, বাড়ীতে দিদিমণি বসে আছে ?

এ ধরনের কথা শুনলে অন্তুর এখন আর রাগটাগ হয় না, আগে হতো। আসলে সরমাদি প্রথম প্রথম যখন পড়াতে আসতেন, অন্তুর নিজেরই পড়তে বসতে ইচ্ছে করতো না। ক্লাস এইটের একটা ছেলে দিদিমণির কাছে পড়ছে—এটা ভেবেই অন্তুর খারাপ লাগতো, লজ্জা করতো।

সরমাদি পড়াতে শুরু করার পরের একদিনের সেই ঘটনাটা অন্তুর মনে পড়ে। অন্তুর সেদিন কিছুতেই পড়তে ইচ্ছে করছিল না। সরমাদি যখন অঙ্কের বই আনতে বললেন, অন্তু ফস্ করে বললো—আমার অঙ্ক ভাল লাগে না, আমি এখন ভূগোল পড়বো।

অন্তুর কথায় সরমাদি বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—আসলে অঙ্কে তোমার ভয় আছে। যাও বইটা নিয়ে এসো, আমি তোমাকে সোজা উপায়ে অঙ্ক কষার কায়দা শিখিয়ে দেব।

অন্তু তবুও বইটা আনেনি। কেমন একটা গোঁ চেপে গেছিল ওর।

সরমাদি একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—আমি মেয়ে বলে আমার কাছে পড়তে তোমার একদম ইচ্ছে করে না, তাই না ? তাছাড়া আজ বোধহয় তোমার বন্ধুরাও এ ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করেছে।

অন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনি থট্‌রিডিং জানেন ? কে কি মনে মনে ভাবছে বলে দিতে পারেন ?

সরমাদি হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন—অবাক হবার কি আছে ? পৃথিবীর সব দেশেই গত হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েরা শুধু রান্নাবান্না, ঘরকন্না করে এসেছে, আর ছেলেরা করেছে পড়াশুনো, রুজী-রোজগারের

জন্য কাজকর্ম। এরজন্যই সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ছেলেদের মনের মধ্যে একটা অহঙ্কারের ভাব গেঁথে আছে। আজ যদি ধরো—কোনো ছেলেকে পড়াশুনোয় সাহায্য নিতে হয় কোনো মেয়ের কাছ থেকে, অথবা অফিসে কোনো ছেলেকে কাজ করতে হয় কোনো মহিলার অধীনে, সেই অহঙ্কারটায় ধাক্কা লাগে তখন। ঠিক এই কারণে তোমারও খারাপ লাগছে আমার কাছে পড়তে।

অন্তু সরমাদির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সরমাদি বলে চলেছিলেন—আসলে তুমিও কোনো মানুষের মনের কথা খানিকটা টের পেতে পারো যদি তুমি তার মানসিক গঠন, যে পরিবেশে সেই লোকটি বেড়ে উঠেছে তার ধরনধারন, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা এসবের কথা জানতে পারো। অনেক সময় সোজাসুজি প্রশ্ন করলে লোকে উত্তর দেয় না। সেক্ষেত্রে আচার আচরণ থেকে তার মানসিক ব্যাপারগুলোর আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। যেমন ধরো, আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতাম—আমার কাছে পড়তে তোমার ভাল লাগে? তুমি ভদ্রতার খাতিরে 'হ্যাঁ' বলতে। তাছাড়া তোমার বাবাকে তুমি ভয় পাও, 'আমার কাছে পড়বে না'—এই কথা বলে বাবার কাছ থেকে বকুনী খেতে চাও না। সেজন্যই তুমি জেদ ধরলে—আমার কথামতো অঙ্ক না করে তুমি ভূগোল পড়বে। তোমার ওই আচরণ থেকে আমি বুঝে নিলাম আমার কাছে তুমি পড়তে চাও না।

অন্তু চুপ করে ছিল। সরমাদি বলে চললেন—মনের ব্যাপার-স্যাপার আবার শারীরিক হাবভাব থেকেও টের পাওয়া যায়। শরীর খারাপ থাকলে—খেলতে কিংবা সিনেমা দেখতে অথবা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতেও ইচ্ছে করে না। আবার দুঃখ কিংবা ভয়ের জন্য যে মানসিক উত্তেজনা হয় তার জন্য রক্তচাপ বাড়ে। তাছাড়া এটাও দেখা গেছে—মানসিক আবেগ কিংবা বেশী চিন্তা-ভাবনা করার সময় আমাদের মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন বেড়ে যায়। তোমার ক্ষেত্রেই ধরো না—যদি এমন হয়, ঘোর অনিচ্ছাতেও আমার কাছে তোমাকে পড়তে হচ্ছে, এবং তার বিরুদ্ধে তুমি কিছুই করতে পারছো না—হয়তো ক'দিন পরেই দেখবে—পড়ার সময় সত্যি সত্যি তোমার মাথা-যন্ত্রণা কিংবা চোখ-জ্বালা শুরু হচ্ছে।

অন্তু লাজুক চোখে হেসেছিল। বলেছিল—আমার কিচ্ছু হবে না—আপনার কাছেই আমি পড়বো সরমাদি।

● ● ●

সরমাদি চুপচাপ বসেছিলেন, অন্তু পায়ে পায়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়ালো।

—পাড়ার মণ্টুদার জন্য ফিরতে দেরী হয়ে গেল সরমাদি।

—মণ্টুদাকে এড়িয়ে আসতে পারলে না বুঝি ? সরমাদি হাসলেন। মণ্টুদাকে তুমি মনে মনে ভয় পাও তাই না ?

অন্তু একেবারে চুপ। সরমাদি বললেন—দাঁড়াও তোমার পড়াগুলো আগে দেখি, তারপর মানুষের ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তোমাকে বলবো।

● ● ●

অন্তুর হোমটাস্কের শেষ অঙ্কটায় 'রাইট' চিহ্ন দিয়ে সরমাদি বললেন—তোমাদের পাড়ার মণ্টুদাকে তুমি তাহলে ভয় পাও। কি, ঠিক তো ?

অন্তুর লজ্জা করছিল, মাথা নিচু করে বললো—শুধু আমি নই সরমাদি, আমাদের পাড়ার সব ছেলেই মণ্টুদাকে ভয় পায়।

সরমাদি হাসলেন। বললেন—মণ্টুদার গা'য় খুব জোর বুঝি ? তোমাদের মারধর করে ?

—না, না, তা নয়। অন্তু মাথা নাড়লো।—তবে সবাই বলে, মণ্টুদার নাকি কিসব দলটল আছে। একবার পুলিশ মণ্টুদার বাড়িও সার্চ করেছিল।

—বেশ, মণ্টুদাকে ভয় পাবার আর কি কারণ থাকতে পাবে বলে তোমার মনে হয় ?

—মণ্টুদা ভীষণ মুখ খারাপ করে, কথায় কথায় গালাগালি দেয়—শুনতে এত খারাপ লাগে…।

অন্তুর কানের ডগায় সিঁদুরে রঙের আভা, তা দেখে সরমাদি মুচকি হেসে বললেন—আমাদের 'ভাল লাগা' বা 'খারাপ লাগা'র সঙ্গে ভয় পাওয়া বা না-পাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে; ব্যাপারটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। ধরো, তোমরা বন্ধুরা মিলে ফুটবল খেলছো মাঠে। এমন সময় একটা লোক মাঠ থেকে হঠাৎ বলটা কুড়িয়ে নিয়ে বললো—যা, তোদের খেলতে দেব না। তোমাদের নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে ? কি করবে তখন ?

—বাঃ, বললেই হলো ? শুধু শুধু আমাদের পেছনে লাগলে, আমরাই বা ছেড়ে দেব কেন ? লোকটার কাছ থেকে বলটা আমরা কেড়ে নেব। অন্তু বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলে।

—কিন্তু লোকটা যদি তোমাদের পাড়ার মণ্টুদা হয়, তখন কি করবে ? তখন কি আর তার কাছ থেকে বলটা কেড়ে নিতে পারবে ?

অন্তু কি বলবে, বুঝতে পারছিল না। সরমাদি বললেন—না, তা করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। ভয়ে হয়তো তোমরা কেউ টুঁ-শব্দটাও করবে না। দেখো, এই যে ভয়টা—এর জন্ম আসলে বিপদের আশঙ্কা থেকে। মণ্টুদা তোমাদের বল কেড়ে নিল। তোমরা যদি মণ্টুদাকে কিছু বলো, তবে

ও পরে তোমাদের বিপদে ফেলতে পারে, তোমাদের ক্ষতি করতে পারে—এই আশঙ্কা থেকেই তোমাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি হবে। আবার এই ভয়ের ফলেই তোমরা হয়তো মাঠ থেকে দৌড়ে পালাবে, নয়তো বা মাঠে আর খেলতেই যাবে না ক'দিন।

—অথচ জানেন সরমাদি, আমরা যখন প্রথম এ পাড়ার আসি, মণ্টুদাকে আমার আর পাঁচজনের মতই লাগতো।

—এর কারণটা এখন বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই ? আসলে তখন তুমি লোকটাকে চিনতে না, জানতে না—অতএব ওর থেকে বিপদ বা ক্ষতির কোন আশঙ্কাও তোমার ছিল না। তারপর যত দিন গেল, তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে তুমি তত বেশী মণ্টুদার কীর্তিকলাপ শুনলে, মণ্টুদার স্বভাব জানলে—তোমার মনে ভয় ঢুকে গেল। বুঝতেই পারছো তাহলে—কোন কিছু জেনে ফেলার ফলে যদি তোমার বিপদের আশঙ্কা বাড়ে তবে ভয়ও বাড়বে। তোমাকে সেই নাপিতের গল্পটা বরং বলি—

কোনো এক গাঁয়ে এক নাপিত ছিল। তার একটা দারুণ গুণ ছিল—খদ্দেরদের চুল দাড়ি কাটতে কাটতে সে মজার মজার সব গল্প বলতো। ফলে তার কাছে লোকের ভীড় লেগেই থাকতো। চুলকাটা বা দাড়ি কামানোর সাথে সাথে যদি ফাউ হিসেবে গল্প শোনা যায়, কে না যাবে সেই নাপিতের কাছে ? এদিকে সেই গ্রামেই ছিল আর এক ক্ষৌরকার—সে বেচারার খদ্দেরই জোটে না। একমাত্র গ্রামের ডাক্তারবাবুরই গোঁফদাড়ি সে নিয়মিত কাটতো। কথায় কথায় একদিন সে ডাক্তারকে বলে ফেললো তার দুঃখের কথা। ডাক্তারবাবু আগেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন—দেখি তোমার জন্যে কি করতে পারি।

দিন কয়েক পরে ডাক্তারবাবু গিয়ে চুলদাড়ি কাটার জন্য হাজির হলেন সেই গল্প-বলা নাপিতের কাছে। নাপিত তো অবাক ! ডাক্তারবাবু কোনদিন তার কাছে আসেন নি। যাই হোক, তাড়াতাড়ি সে তার যন্ত্রপাতি—মানে, ক্ষুর, কাঁচি, চিরুনী নিয়ে কাজ শুরু করলো—আর সেই সঙ্গে শুরু করলো তার গল্প। একটু পরেই ডাক্তারবাবু হৈ হৈ করে উঠলেন—আরে সাবধানে কাঁচি চালাও। একটু এদিক ওদিক হলেই আমার চোখের বারোটা বাজবে।

—না বাবু, কাঁচি আপনার চোখে লাগবে না। নাপিত কাঁচুমাচু গলায় বললো।

ডাক্তারবাবু বিরক্ত হলেন, বললেন—তুমি তো আর 'অ্যানাটমী-ফিজিওলজি'র কিছু জানো না। আমাদের ঘাড়ের পাশ দিয়ে দরকারী কিছু নার্ভ চলে গেছে ব্রেনে। তোমার ঐ কাঁচির খোঁচায় যদি তা ছিঁড়ে যায়—তবে মস্তিষ্কের ক্ষতি হবে, অন্ধ হয়ে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।

এরপর দাড়িকাটা শুরু হওয়ার আগে ডাক্তারবাবু ঝুলপির তলায় রগের এ্যানাটমি বোঝালেন, মানুষের ঘাড়, মাথা বা গালের চারপাশ দিয়ে দরকারী কত শিরা-ধমনী বয়ে গেছে, তাদের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি নিয়ে আধঘণ্টা ধরে লেকচার দিলেন এবং তা শোনার পর নাপিতের মধ্যে যথারীতি কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। চুল-দাড়ি কাটার সময় সে অতি সাবধানে ক্ষুর, কাঁচি চালাতে শুরু করলো। খদ্দেরদের সাথে গল্প করা তো দূরের কথা—কাজের সময় সাধারণ দু'একটা কথা বলাও সে বন্ধ করে দিল। তার তখন ভয়—পাছে তার অসাবধানতায় খদ্দেরের মারাত্মক কিছু না হয়ে যায়!

অন্তু হেসে ফেললো।—তার মানেই ওর খদ্দেরও কমতে শুরু করলো—আর লোকজন বেশী করে যেতে আরম্ভ করলো দ্বিতীয় নাপিতের কাছে। ভারী মজা তো! আগের নাপিতটা যতক্ষণ শরীরের অ্যানাটমি'র কথা জানতো না, ততক্ষণ সে নির্ভয়ে চুল দাড়ি কাটতো। যেই তা সে জেনে ফেললো অমনি ভয় ঢুকে গেল তার মনে।

সরমাদি হাতের ঘড়ি দেখছিলেন। অন্তু বললো—অথচ অ্যাদ্দিন ভাবতাম—লোকে যত বেশী জানে, ততই তো তাদের মনের ভয় কেটে যায়। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন কুকুর-বিড়াল দেখলে ভীষণ ভয় পেতাম। তারপর যেই বড় হলাম—জানলাম ওরাই মানুষ দেখলে দৌড় দেয়। ব্যাস আমার ভয়টাও কেটে গেল।

সরমাদি শাড়ীর আঁচলটা ঠিক করতে করতে বললেন—আসলে কোনো কিছু জানার ফলে তোমার বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে না কমছে তার ওপরই নির্ভর করবে—তুমি ভয় পাবে কি পাবে না। যখন তুমি ছোট ছিলে, তোমার মা হয়তো খাওয়ানোর সময় বলতেন—শীগ্‌গির খেয়ে নাও, নয়তো কুকুরটাকে ডাকবো, তোমায় ধরে নিয়ে যাবে। কুকুর তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে—এটা জানার ফলে বিপদের আশঙ্কা থেকে তোমার মনে ভয় ঢুকলো। আবার পরে যখন জানলে, কুকুর মানুষকে ধরে নিয়ে যেতে পারে না—তখন তোমার বিপদের আশঙ্কাটা কেটে গেল—ফলে ভয়টাও আর রইলো না।

সরমাদি এবার চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বললেন—এই দেখ না, আমার নিজেরই এখন ভয় করছে বাড়ী ফিরতে। এত রাত হয়ে গেল, মা যা রেগে থাকবে না…

অন্তু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

ভয় এড়ানোর উপায়

জানেন, আজ স্কুলে দারুণ এক কাণ্ড হয়েছে ! সরমাদিকে ঘরে ঢুকতে দেখে অন্তু বলে উঠলো।

—কি কাণ্ড, শুনি। সরমাদি টেবিলের উপর ছাতা আর লেডিস-ব্যাগটা রেখে বললেন।

—আজ তো আমাদের জ্যামিতির ক্লাস-টেস্ট ছিল। আমার পাশেই বসে ব্লেড দিয়ে পেন্সিল কাটছিল প্রবীর। একটু পরেই দেখি, আঙুল কেটে ওর রক্ত পড়ছে। আমাদের অঙ্কের স্যার পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন, ওই ব্যাপার দেখে একটা ছেলেকে অফিস ঘরে পাঠালেন তুলো আর আয়োডিন আনতে। ঠিক তখনই ওই কাণ্ডটা ঘটলো—

অন্তু যেভাবে চোখ বড় বড় করে ঘটনাটা বলছিল তা দেখে সরমাদি হেসে ফেললেন। অন্তু বললো—বললে বিশ্বাস করবেন না, আমার সামনের বেঞ্চের একটা ছেলে—নতুন ভর্তি হয়েছে আমাদের স্কুলে, ওই রক্ত দেখেই ক্লাসের মধ্যেই কেমন যেন চেঁচিয়ে উঠলো ! আমরা সবাই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখি—ভয়ে ওর চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ! তারপর হঠাৎ মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ছেলেটা।

—ছেলেটা রক্ত দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ সরমাদি। রক্ত দেখে প্রচণ্ড ভয় পাওয়ার জন্যই ও অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে আসার পরও দু'বার 'রক্ত ! রক্ত !' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

অন্তু থামলো। সরমাদি মন দিয়ে অন্তুর কথা শুনছিলেন।

—আচ্ছা সরমাদি, আপনি সেদিন বলেছিলেন, বিপদের আশঙ্কা থেকে ভয়ের জন্ম হয় আমাদের মনে। অথচ আজ হাত কেটেছিল, রক্ত পড়েছিল প্রবীরের—তবে ওই নতুন ছেলেটা অমন ভয় পেলো কেন ?

—কি জানো অন্তু, ভয়ে যখন ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেল তখন বুঝতে হবে ওর ভয়টাও ছিল অস্বাভাবিক। এ ভয়ের পেছনে কারণ যাই থাক, আপাতদৃষ্টিতে ভয়টাকে নেহাতই অযৌক্তিক বলে মনে হবে। এই ধরনের ভয়কে বলা যেতে পারে—'ফোবিয়া'।

—জানেন, আমার এক পিসী আছে—ঘরের মধ্যে আরশোলা দেখলেই লাফঝাঁপ, চীৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয় !

—হ্যাঁ, এটাও এক ধরনের ফোবিয়া। আরশোলা দেখে অস্বস্তি বা একটু-আধটু ভয় কার না হয়—অন্ততঃ মেয়েদের তো হয়ই। এ ভয়টা স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ একই জিনিষ দেখে যদি কেউ আতঙ্কে শিরশির করে কাঁপতে থাকে, বুঝতে হবে—এই ভয়টা অস্বাভাবিক। একরকম মনের অসুখই বলা যেতে পারে একে। শুধু আরশোলা বা রক্তই নয়, অন্য বহু জিনিষেই 'ফোবিয়া' হতে পারে। যেমন, কেউ একা একা ঘরে থাকতে ভয় পায় ; কেউ একেবারেই অন্ধকারে থাকতে পারে না ; কুকুর-বিড়ালে কারও কারও আতঙ্ক থাকে ; কেউ বা সব সময় মনে করে এই বুঝি তার শরীরে কোন রোগ-জীবানু ঢুকলো। লক্ষ্য করে দেখবে, অনেকেরই হাত ধোওয়ার বাতিক আছে। এর কারণও ওই জীবাণু সংক্রমণের আতঙ্ক।

—কেন সরমাদি, কেন লোকের মনে এমন সব অদ্ভুত আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ? অন্তু জিজ্ঞাসা না করে পারে না।

—আমি তো আগেই বলেছি, এই আতঙ্ক বা ফোবিয়া আসলে এক ধরনের অসুখ। সরমাদি শুরু করলেন।—সব অসুখেরই যেমন কারণ থাকে, বিভিন্ন ধরনের ফোবিয়ারও তেমনি কোন না কোন কারণ থাকে। তোমার যে বন্ধু আজ রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল—তার কথাই ধরো। এমন হতে পারে, ওর জীবনে হয়তো বারকয়েক ভয়াবহ রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছে। আবার এমনও হতে পারে, ছোটবেলায় হয়তো ওর কোন একান্ত আপনজনের মৃত্যুর সঙ্গে রক্তপাতের কোন ঘটনার সাক্ষী ও নিজেই। এর ফলেই হয়তো কোন এক সময় রক্ত বা রক্তপাত নিয়ে ভয়াবহ আতঙ্ক ওর মনে ঢুকেছে।

সরমাদি থামলেন। অন্তু অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিল, এবার বলে ফেললো—এ অসুখ থেকে সেরে ওঠার রাস্তা নেই ?

—কেন থাকবে না ? সরমাদি উত্তর দিলেন।—যদি রোগীর ভয় পাওয়ার মূল কারণটা কোনভাবে জানতে পারা যায়, রোগীকে যদি তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় তবে অনেক সময়ই রোগী ভাল হয়ে ওঠে। আসলে রোগীর জীবনে কখন, কোথায়, কি জাতীয় ঘটনা বা দুর্ঘটনা তার আতঙ্কের মূল কারণ—বেশীর ভাগ সময়ে তা খুঁজে বের করাই মুশকিল। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন ধরো—এ্যারোপ্লেনের পাইলট কোন প্লেনঅ্যাক্সিডেন্টে পড়লে ভয়ে পরে আর প্লেন চালায় না। মোটর গাড়ীর ড্রাইভার কিংবা ভয়াবহ কোন যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এমন সৈন্যদের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ দেখা যায়। এঁদের আতঙ্কের কারণটা পরিষ্কার—কিন্তু

দেখা গেছে, এঁদের অনেক বোঝালেও কোন লাভ হয় না।

—তাহলে ?

—হ্যাঁ, এঁদেরও অবশ্য ভয় তাড়ানোর ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানীরা করেছেন। ওঁরা দেখেছেন বিপদের আশঙ্কা আছে কোন ঘটনা বারকয় ঘটিয়ে মানুষের মনে ভয় বা আতঙ্ক চিরস্থায়ী করে দেওয়া যায়। ইংরাজীতে একেই বলে 'কন্‌ডিশনিং'।

অন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না, বললো—কিন্তু ভয়টা কি করে কাটবে সরমাদি ?

—বলছি। সরমাদি আবার শুরু করলেন।—অভ্যাসের বশে যে ভয়টা মনের মধ্যে গড়ে ওঠে, নতুন একটা অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে সেই ভয়টা কাটিয়েও ওঠা যায়। উদাহরণ দিয়ে বলছি ঃ ধরো যে ছেলেটা অ্যালশেসিয়ান কুকুর দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠে—তাকে যদি প্রথমে একটা ইঁদুর, তারপর একটা খরগোশ বা বিড়াল, তারপর একটা কুকুরের ছবি বার-কয়েক দেখানোর পর যদি একটা ছোট কুকুর যেমন ফক্সটেরিয়ারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তবে দেখা যাবে, সে কুকুর দেখে একটু নার্ভাস হয়ে পড়লেও আগের মতো আর ভয়ে শিউরে উঠছে না। এরপর ধাপে ধাপে ছোট থেকে মাঝারি, মাঝারি থেকে বড়সড় কুকুর—এমনকি অ্যালশেসিয়ানের কাছে নিয়ে গেলেও সে আর ভয় পাবে না।

কিছুদিন আগের এক ঘটনা বলি। একবার দেখা গেল, কিছু ব্রিটিশ পাইলট কিছুতেই আর প্লেন নিয়ে আকাশে উড়তে চাইছেন না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওঁদের প্রত্যেকেই অতীতে এক আধবার বিমান-দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ওঁদের প্রত্যেককেই একটা ঘরে বসিয়ে অ্যারোপ্লেন এবং আকাশে ওড়ার সঙ্গে যুক্ত নানাধরনের পরিস্থিতির কথা ভাবতে বলা হলো। কেউ ভাবতে লাগলেন, তিনি যেন এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে আছেন, আবার কেউ বা ভাবলেন—প্লেনের যাত্রীদের যেন খেতে দেওয়া হচ্ছে। এরপর, মানসিক রোগের একজন ডাক্তার ঐসব পাইলটের ভয়ঙ্কর কিছু সিচুয়েশনের কথা ভাবতে বললেন, যেমন প্লেন চালানোর সময় তাঁদের যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করছে না, কিংবা বৃষ্টির জন্য রানওয়েতে নামতে যেন অসুবিধে হচ্ছে—এইরকম আর কি। এইভাবে একসময় তাঁদের সত্যিকারের বিমান দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করতে বলা হলো।...

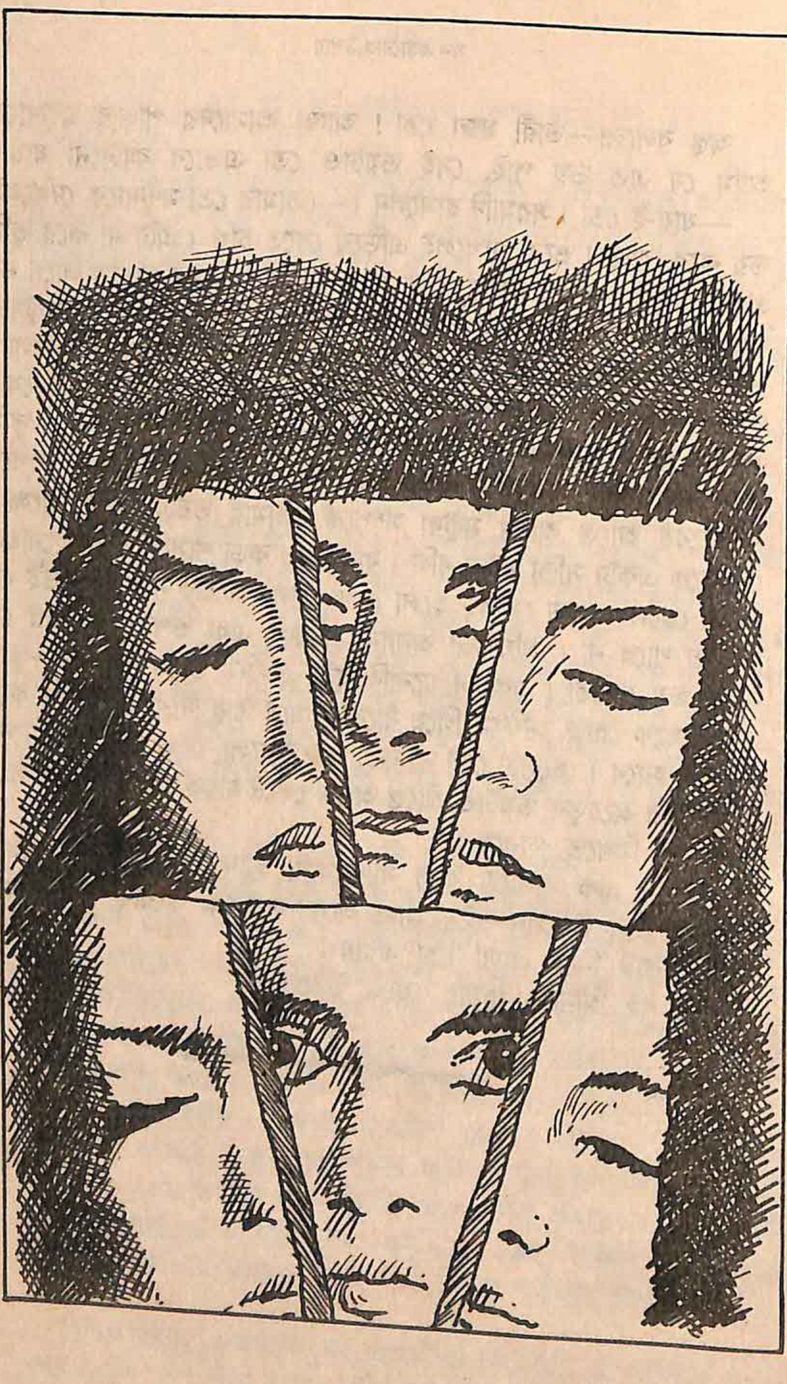
ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারর্ফোসের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ঐ প্রক্রিয়ার মাত্র ৯ ঘণ্টা থেকে ৪৫ ঘণ্টার মধ্যে পাইলটদের সকলেরই আকাশে ওড়ার আতঙ্ক দূর হয়েছে।

অন্তু বললো—ভারী মজা তো ! আচ্ছা আমাদের পাড়ার মণ্টুদাকে আমি যে এত ভয় পাই, সেই ভয়টাও তো এভাবে কাটানো যায়।

—যায়-ই তো । সরমাদি হাসলেন ।—তোমার তো মণ্টুদাকে দেখলেই ভয় করে, রাস্তায় ওকে দেখলেই এড়িয়ে যেতে চাও । এটা না করে তুমি প্রথমে মণ্টুদার দলের কোন ছেলে যাকে তোমার তেমন খারাপ লাগে না, তার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলো, ভাব জমাও । তারপর যখন সে মণ্টুদার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তখনও মণ্টুদার সামনে তাকে ডেকে কথা বলো । তাছাড়া মণ্টুদা বা ওর দলের সবার দিকেই সবসময় সোজাসুজি তাকাবে । একদিন হয়তো তোমার ওই বন্ধুকে দেখতে পেলে না মণ্টুদার দলে । তুমি তখন সোজাসুজি মণ্টুদার কাছেই ছেলেটার খোঁজখবর করো। দেখবে এইভাবেই আস্তে আস্তে মন্টুদা সম্পর্কে তোমার ভয়টা কেটে যাচ্ছে। তোমাকে একটা সত্যি ঘটনা বলি । বাবা মা'র কড়া শাসনে মানুষ হয়েছিল একটা ছেলে । যখন সে বড় হলো দেখা গেল, কারোর সঙ্গে কিছুতেই সে মিশতে পারে না । অফিসের অন্যান্য সহকর্মী এবং ওপরওয়ালাদের সে দারুণ ভয় পেতো । একজন মনোবিজ্ঞানী একদিন তাকে বললেন—তুমি এখন থেকে রোজ অফিসে গিয়ে যাঁকে দেখবে তাঁর দিকে হাতজোড় করে নমস্কার করবে । ছেলেটা যেই তা করা শুরু করলো, দেখা গেল তার মনের ভেতরকার অহেতুক ভয়টাও আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে ; সে লোকের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারছে ।

সরমাদি এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘড়ির দিকে খেয়াল পড়তেই বলে উঠলেন—ইস্ আজ অনেকক্ষণ গল্প করেছি, যাও—অঙ্ক বইটা চটপট্ নিয়ে এসো তো এবার ।

অন্তু বই আনতে চেয়ার ছেড়ে উঠলো ।



কেন ভুলে যাই ?

কেমন দেখে এলে তোমার দাদুকে ? ভাল আছেন তো ?—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সরমাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

অনেকক্ষণ ধরেই জ্যামিতির একটা বদখৎ এক্সট্রাকে বাগে আনার চেষ্টা করছিল অন্তু। সরমাদিকে ঘরে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—না সরমাদি, একদম ভাল না। কাউকেই চিনতে পারছে না! আমাকে তো কত ভালবাসে; সেই আমি কত করে দাদুকে ডাকলাম—কিন্তু দাদু আমাকেও চিনতে পারলো না।

—ডাক্তারবাবু কি বলছেন ?

—ডাক্তারবাবু তো বলছেন, দাদুর নাকি সেদিন বাথরুমের মধ্যে ছোটখাট একটা ষ্ট্রোকমতন হয়েছিল—তার জন্যই নাকি অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল। কাল মামাবাড়ি গিয়ে দেখি দাদু শুয়ে আছে বিছানায়; খাটের চারপাশে দিদিমা আর মামা-মামীরা। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দাদু আমাকে বললো—জানো, বীরেন একবার আমাকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিল। ওঃ কি দারুণ জায়গা! প্রাসাদের মত সব বাড়ীঘর; রাস্তার মোড়ে মোড়ে গোরা সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে।...

—বাবা-মা, আমি কেউই দাদুর কথা কিছু বুঝতে পারছিলাম না। বড়মামা বললো, দাদু ঐ অ্যাক্সিডেণ্টের পর থেকেই নাকি আশপাশের কাউকেই ভাল করে চিনতে পারছে না। উল্টে, ছোটবেলার সব ঘটনা নাকি অনর্গল বলে যাচ্ছে! দাদুর নাকি 'বীরেন' নামের এক বন্ধু ছিল। তার সঙ্গে দাদু প্রথম কলকাতায় এসেছিল ১৯৩৬ সালে।

সরমাদি আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বললেন—এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আসলে তোমার দাদুর মাথায় আঘাত লাগার দরুণ শরীরের মধ্যেকার রক্ত চলাচল আর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। সাধারণতঃ এ জাতীয় অবস্থার পর সদ্য-জানা জিনিষগুলো মানুষ সাময়িকভাবে ভুলে যায়। আসলে, স্মৃতি ধরে রাখার ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মস্তিষ্কের বিশেষ কতকগুলি জায়গা। সাধারণতঃ কোনো

অ্যাক্সিডেন্টের ফলে মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডার নাড়াচাড়া খেলে পুরনো স্মৃতি যা চাপা পড়ে ছিল ভাঁড়ারের একদম তলায় তা আবার উপরে উঠে এসে নতুন হালফিল স্মৃতিকে চাপা দিয়ে দেয়।

তবে ভরসার কথা, স্মৃতি লোপ পাওয়ার এই ব্যাপারটা বেশীদিন থাকে না। তোমার দাদুও দেখো—আস্তে আস্তে হারানো স্মৃতিগুলো ফিরে পাবেন, তোমাদের আবার চিনতে পারবেন।

অন্তুর মুখ থেকে মেয়ের ছায়াটা যেন এতক্ষণে একটু সরে যায়।—দুর্ঘটনার সময় মাথায় আঘাত পেলে মানুষের হালফিল স্মৃতি কেন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সে বিষয়ে শারীরবিজ্ঞানীরাও মাথা ঘামিয়েছেন বিস্তর। সরমাদি বলে চলেন।—ওঁরা দেখেছেন, মাথায় চোট পেয়ে কেউ হয়তো হাসপাতালে ভর্তি হলো ; দিন কয়েক চিকিৎসার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে সে হয়তো আঘাত পাওয়ার ঘটনা কিংবা হাসপাতাল-বাসের কথা বেমালুম ভুলে গেল ! অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শরীরবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন—হালফিল স্মৃতিগুলিকে ধরে রাখার ব্যাপারে মস্তিষ্কের 'হিপোক্যাম্পাস' অংশটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জন্তু কমবয়েসী রোগীর কথা পড়েছি—যার ফিটের ব্যামো ছিল বলে তার মাথায় অপারেশন করে 'হিপোক্যাম্পাস' অংশটি বাদ দেওয়া হয়। সুস্থ হয়ে ওঠার পর দেখা গেল, দেখা বা শোনার ব্যাপারে সে আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক হলেও সদ্য দেখা বা শোনা কোনও জিনিষই সে মনে রাখতে পারছে না। দেখা গেল, বহুদিন আগে শেখা কোনও কবিতা বা লেখা গড়গড় মুখস্ত বলে গেলেও, নতুন করে পরিচয় হওয়া মানুষদের নাম বা চেহারা সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। আশ্চর্যের কথা, নিজের বাড়ীর রাস্তাও সে প্রায়শঃই ভুল করতো। মস্তিষ্ক থেকে হিপোক্যাম্পাস-কে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই যে বেচারার এমন দুরবস্থা—তা বুঝতে কি আর বাকী থাকে ?

কথা শেষ করে সরমাদি জ্যামিতির বইটা টেনে নিতেই অন্তু ফস্ করে বলে উঠলো—আচ্ছা সরমাদি, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থাতেও তো সময় সময় আমরা অনেক কিছু মনে করতে পারি না। যেমন ধরুন—বাড়ীতে বারবার পড়ে মুখস্থ করা একটা কবিতা ক্লাসে মাষ্টার মশাই-এর সামনে বলতে গিয়ে বার বার আটকে যায় !

—আমাদের 'মনে রাখা'র ব্যাপারটা যদি বুঝতে চাও তবে তার আগে পরের ব্যাপারটাও তোমাকে জানতে হবে। সরমাদি শুরু করলেন।—'মনে রাখা'র কথা উঠলেই প্রশ্ন আসবে—কি মনে রাখবো ?

—যা শিখেছি তাই মনে রাখবো। অন্তু জবাব দিল।

—ঠিক। তাহলে প্রথমেই আসছে শেখার ব্যাপারটা। কোন কিছু শেখাটা যদি ঠিকমতো হয় তবে তা মনেও থাকে বেশী। মাষ্টার মশাইরা যে বলে থাকেন—কোন কিছু মুখস্থ করার আগে তা ভাল করে বুঝে নেবে—এর কারণও এটাই। অবশ্য শুধু বুঝলেই হবে না। শেখা জিনিযটাকে মনে ধরে রাখার ইচ্ছেটাও থাকতে হবে। যেমন—ভূগোল পরীক্ষার জন্য তুমি হয়তো বাছা বাছা দশটা প্রশ্ন ভাল করে পড়লে। পরীক্ষায় ওগুলো থেকেই 'কমন্' আসবে বলে তোমার নিশ্চিত ধারণা। পরীক্ষার একদিন আগে হয়তো কি মনে করে বাড়তি আরও কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর তৈরী করে নিলে। দেখা যাবে—পরীক্ষার হলে যদি ঐ দশটার বাইরে তোমার জানা প্রশ্নও আসে, তুমি তার উত্তর ঠিকমতো মনে করতে পারছো না। এর কারণ প্রথম দশটা প্রশ্ন তুমি যত আগ্রহ নিয়ে পড়েছিলে, পরের দফার প্রশ্নগুলি নিয়ে ততটা আগ্রহ তোমার ছিল না ; তুমি ধরেই নিয়েছিলে, সেগুলি পরীক্ষায় আসবে না। ফলে, বুঝে পড়লেও তুমি সেগুলিকে মনে রাখতে পারোনি। এছাড়া, কোনোকিছু ভুলে যাওয়ার পেছনে 'সময়'-এর একটা ভূমিকা থাকে। আজ একটা পড়া মুখস্ত করলে—তোমার আগামীকাল সেটা যতটা মনে থাকবে, তার চেয়ে অনেক কম মনে থাকবে সাতদিন পরে। তার কারণ—সব সময়ই তো আমরা কিছু শিখছি, জানছি, আর তা সবই স্মৃতিভাণ্ডারে গিয়ে জমা হচ্ছে—ফলে নতুন স্মৃতি ক্রমশঃই পুরনো স্মৃতিকে চাপা দিয়ে দিচ্ছে। এই জন্যই পরীক্ষায় আসবেই এমন কোন জিনিষ যদি মনে রাখতে চাও—তবে পরীক্ষায় আগের দিন রাত্রিবেলা সেটা ভাল করে পড়ে নিয়ে ঘুমতে যাবে। ঘুমনোর সময় আমাদের নতুন কিছু শেখা বা জানা হয় না—ফলে ছ'সাত ঘণ্টা পরে ঘুম থেকে উঠেও দেখবে সমস্ত পড়াটাই প্রায় হুবহু মনে পড়ছে।

বাড়ী যাবেন বলে সরমাদি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, অন্তু ফস্ করে বললো—'স্মৃতিবর্ধক' বলে কাগজে যেসব ওষুধের বিজ্ঞাপন বেরোয়, ওগুলো খেলে সত্যিই কি স্মৃতিশক্তি বাড়ে ?

—ধ্যাৎ, তাই কখনো হয় ? সরমাদি হাসলেন।—আসলে ওসবের মধ্যে 'অ্যাম্‌ফিটামিন' জাতীয় ওষুধ মেশানো থাকে—যাদের কাজ হলো আমাদের 'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম'কে উত্তেজিত করা। এর ফলে শরীরের অবসাদ কেটে যায়, ঘুমটুম আর আসে না। রাত জেগে পড়াশুনোর ব্যাপারে এসব ওষুধ বেশ কাজ দেয়। চা-কফিরও এই গুণ খানিকটা রয়েছে। 'অ্যামফিটামিন' জাতীয় ওষুধ অবশ্য উপকারের চেয়ে অপকারই করে বেশী। এগুলি দীর্ঘদিন খেলে রক্তচাপ বাড়ে, ঘনঘন মাথাযন্ত্রণা, পেটের গণ্ডগোল এবং আরও নানা উপসর্গ দেখা দেয়। অতএব ওষুধ খেয়ে স্মৃতিশক্তি বাড়ানো—নৈব নৈব চঃ।

মনে রাখার কায়দা-কানুন

পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। নতুন ক্লাস শুরু হতে অবশ্য এখনও ঢের বাকী। অন্তুর তো দারুণ মজা! সারাদিন কাটে ক্রিকেট খেলে আর রেডিওতে ইণ্ডিয়া-ইংল্যাণ্ড টেষ্টম্যাচের রিলে শুনে। অবশ্য অসুবিধেও আছে—শীতকালের ছোট বেলা, বিকেল হ'তে না হ'তেই সন্ধ্যে। আর সন্ধ্যে মানেই তো পড়ার টেবিলের সামনে গিয়ে বসা, তা সে পরীক্ষা থাকুক বা নাই থাকুক। সারাদিন হুটোপাটির পর সন্ধ্যেবেলা পড়ার বই-এর সামনে বসে কাঁহাতক আর হাই তোলা যায়। এদিকে বাবার হুকুম—রাত ন'টার আগে শুতে যাওয়া চলবে না।...

সেদিনও সন্ধ্যেবেলা চেয়ারে বসে ক্রমাগত ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ "খিক্" করে একটা হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠে সরমাদিকে দেখতে পেলো অন্তু। কখন যে নিঃশব্দে এসে সামনের চেয়ারটায় বসেছেন তা টেরই পায়নি ও; তবে প্রথমটায় অপ্রস্তুত হলেও অনেকদিন পর সরমাদিকে দেখতে পেয়ে মনে মনে খুশিই হলো। সরমাদি হেসে বললেন—কি হে শ্রীমান, আমার ফর্‌মূলা কেমন কাজে লাগলো?

অন্তুতো অবাক! বললো—কিসের ফর্‌মূলা?

সরমাদি বললেন—বাঃ রে, পড়া মনে রাখার ফরমূলা। তোমাকে বলেছিলাম না, পরীক্ষায় আসবেই এমন জিনিষগুলো পরীক্ষার আগের দিন রাত্রিবেলা ঘুমনোর ঠিক আগে ভাল করে দেখে নেবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখবে সমস্ত পড়াটা হুবহু মনে পড়ছে।

অন্তু হেসে বললো—না সরমাদি, ও ফর্‌মূলা পরখ করা হয় নি। সন্ধ্যে থেকেই আমার যা ঘুম পায়—তবে হ্যাঁ, আপনি সেদিন বলছিলেন না—যা শিখছি তা যদি মনের মতো হয় মানে যদি আমরা জিনিষটাকে মনে ধরে রাখতে ইচ্ছে করি তবে তা মনে রাখতে পারি—কথাটা একদম সত্যি। আমি তো সেদিন হাতেনাতে প্রমাণ পেলাম।

সরমাদি হেসে বললেন—কি রকম?

—আমাদের সঙ্গে পড়ে অতুল, একদিনও ক্লাসে পড়া বলতে পারে না। অন্তুর বর্ণনা শুরু হলো।—আসলে পড়া বলবে কি—ও তো কিছু মনেই

রাখতে পারে না। তা মাঝে একদিন স্কুলে গেছি ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতা দেখাতে, দেখা হলো অতুলের সঙ্গে, আরো অনেকে ছিল। ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা ক্রিকেট-টেস্টের গল্প করছি—আমাদের মধ্যে কে যেন বললো ইংল্যাণ্ডের বোথাম নাকি ফার্স্ট টেস্টে দু'টো ইনিংস মিলিয়ে সাতটা উইকেট পেয়েছে। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, অতুল এগিয়ে এসে বললো—না ওটা সাতটা নয়, ন'টা। শুধু তাই না, বোথাম গত বছরের জুবিলী টেস্ট আর এবারের ফার্স্ট টেস্ট, সেকেণ্ড টেস্টে মোট কত রান করেছে, আর ক'টা উইকেট নিয়েছে গড়গড় করে বলে গেল। পরে ভেবে দেখলাম—ক্রিকেটে নিশ্চয়ই ওর ইন্টারেস্ট খুব বেশী। তাই বোধহয় স্কোরবোর্ড ওর মুখস্থ হয়ে গেছে।

সরমাদি বললেন—দাঁড়াও তোমাকে আজ স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর কয়েকটা কায়দা শিখিয়ে দিই।

অন্তু নড়েচড়ে বসলো। সরমাদি শুরু করলেন।

—দেখ, স্মৃতিশক্তির সঙ্গে বুদ্ধির কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে। যার বুদ্ধি বেশী, তার যেমন কোন কিছু শেখার ক্ষমতা বেশী, তেমনি শেখা জিনিষ সে মনের মধ্যে ধরেও রাখতে পারে বেশী। তবে কোন কিছু শেখারও কতকগুলো কায়দা আছে যা জানলে—বুদ্ধি খুব প্রখর না হলেও শেখা জিনিষটাকে মনে বেশীদিন ধরে রাখা যায়। যেমন ধরো, যখনই কোন কিছু পড়বে, সেটা আগে ভাল করে বুঝে নিয়ে পড়বে। অনেকে দেখবে ইতিহাস মুখস্ত করার সময়—'আওরঙজেবের বাবার নাম ছিল সাজাহান, আওরঙজেবের বাবার নাম ছিল সাজাহান, আওরঙজেবের...' এইভাবে একটার পর একটা লাইন পড়ে মুখস্ত করে। এতে কিন্তু পড়াটা মনে থাকে কম। তার চেয়ে বরং যদি আওরঙজেবের জীবন, রাজ্যশাসন বা পতনের কারণগুলো প্রথমে ভাল করে বুঝে নিয়ে, বই বন্ধ করে মনে মনে সেগুলোকে আওড়াতে গেলে অথবা খাতায় পয়েন্টগুলো লিখে ফেলতে গেলে দেখা যাবে অনেক জায়গা ঠিক মনে পড়ছে না। সেই জায়গাগুলো একবার দু'বার পড়ে নিলে দেখবে পড়াটা খুব অল্প সময়ে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। ঠিক তেমনিই বীজগণিতের ফর্মূলা মুখস্থ করবার আগে, সেটা কি করে তৈরী হলো তা যদি বুঝে নেওয়া যায় তবে দেখবে ফর্মূলাটা মনে থাকবে অনেক বেশী।

—কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে এত না বুঝে টুঝে মুখস্থ করলেও তো দেখি, দিব্যি তা মনে থাকে! অন্তুর গলায় বিস্ময়।

—কবিতার ব্যাপারটা আলাদা। সরমাদি উত্তর দিলেন।—অনেক কবিতা বা ছড়ার তো কোন মানেই থাকে না। যেমন সেই কোন্ ছোটবেলায় পড়েছি—

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎপটাং।
মুস্কিল আসান উড়ে মালি,
ধর্মতলায় কর্মখালি।

এ ছড়াটা তো একেবারেই অর্থহীন, ইংরাজীতে যাকে বলে ননসেন্স রাইম। তবু দেখ দিব্যি মনে আছে। আসলে একটা বিশেষ ছন্দে বারবার পড়তে পড়তে একসময় ছড়াটা ছবির মতো হয়ে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। তবে হ্যাঁ, কবিতা মুখস্থ করতে বুদ্ধি বেশী না লাগলেও একবার কবিতা মুখস্থ করার পর কিছুদিন বাদে বাদে যদি তা না ঝালানো যায় তবে তা স্মৃতিভাণ্ডারে জমা থাকলেও প্রয়োজনের সময়ে খুঁজে পাবে না।

অন্তু চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। সরমাদি থামতেই বলে উঠলো—এতো গেল পড়া মুখস্থ করার ব্যাপার। কিন্তু এমন তো হয়—রাস্তায় হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা হলো। মুখটা খুব চেনাচেনা, কিন্তু কিছুতেই নামটা মনে করতে পারছি না।...

—হ্যাঁ তা তো হয়ই। সরমাদি জবাব দিলেন।—এক্ষেত্রে লোকটার মুখের ছবিটা তোমার মনে গেঁথে আছে—হয়তো নামটা ভাল করে শোননি, অথবা তার নামটা এতই সাধারণ যে তোমার মনে দাগ কাটে নি। তাই লোকটার মুখ মনে পড়লেও নামটা কিছুতেই মনে আসেনি। এখন থেকে যখনই কারোর সঙ্গে আলাপ হবে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দু'চারবার তার নামটা বলবে। যেমন ধরো 'শ্যাম' বলে কারোর সঙ্গে আলাপ হলো। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তুমি বলবে—আচ্ছা শ্যামদা আপনি কোথায় থাকেন ? শ্যামদা, আমাদের বাড়ী একদিন আসবেন, আজ চলি শ্যামদা'—এইরকম কয়েকবার বলার পরই দেখবে শ্যাম নামটা তোমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

অন্তু বললো—ভারী মজা তো !

সরমাদি বললেন—হ্যাঁ, মনে রাখার এমন মজার মজার অনেক কায়দা আছে। ধরা যাক, কোন সংখ্যা মনে রাখতে হবে। তোমাকে একজনের বাড়ী যেতে হবে যার নম্বর ২১০/সি। একটু চিন্তা করে দেখলে তোমার মনে পড়বে, ২১০ হলো ৪২০'র অর্দ্ধেক। আজেবাজে লোকেদের আমরা "ফোর টুয়েন্টি" বলি। এদিকে তুমি আবার তোমার ক্লাসের 'সি-সেকশনে' পড়। এখন তুমি যদি 'ফোর টুয়েন্টি' আর তোমার 'সি-সেক্‌শন' মনে রাখতে পার, তবে ২১০/সি তোমার চট্‌ করে মনে পড়বে।

অন্তু হাসছিল। সরমাদি বললেন—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? বারট্রান্ড রাসেলের নাম শুনেছো ? পৃথিবীর একজন সেরা দার্শনিক। একবার এক

হোটেলে উনি ১৪১৪ নম্বর ঘরে উঠেছিলেন। একদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে যখন কিছু লোকের সঙ্গে উনি কথা বলছেন, একজন জিজ্ঞাসা করলো—আপনার ঘরের নম্বরটা মনে আছে তো ? রাসেল সাহেব হেসে বললেন—ওটা কি ভুল হয়। ২ এর বর্গমূলটা মনে রাখলেই তো হলো। আসলে ২ এর বর্গমূল হলো ১·৪১৪। 'দশমিক'টা সরিয়ে নিলেই তো ওটা রাসেল সাহেবের ঘরের নম্বর হয়ে যায়।

অন্তু হেসে বললো—দারুণ বুদ্ধি।

বারট্রান্ড রাসেলের ঘরের নম্বর মনে রাখার যে গল্পটা সেদিন বলেছিলেন সেটা যাকেই বলেছি, সেই বলেছে, 'দারুণ'—সরমাদিকে ঘরে ঢুকতে দেখেই অন্তু বলে উঠলো।—বাবা তো আপনার গল্প শুনেই মনে রাখার বেশ কতকগুলো মজার কায়দা বলে দিল।

—কি বললেন, শুনি। সরমাদি চেয়ার টেনে বসলেন।

—ছোটবেলায় বাবারা নাকি মোগল বাদশাদের নামগুলো পরপর মুখস্থ রাখতো একটা অদ্ভুত সেনটেন্সের মধ্যে দিয়ে। কথাটা হলো—'বাবার হইল আবার জ্বর, সারিল ঔষধে'।

সরমাদি হেসে ফেললেন। বললেন—জানি। 'বাবার' মানে বাবর, 'হইল' হচ্ছে হুমায়ূন ; 'আবার' হলো আকবর ; 'জ্বর' হলো জাহাঙ্গীর ; 'সারিল' হচ্ছে সাজাহান আর 'ঔষধে' হলো ঔরঙ্গজেব। কেমন পরপর নামগুলো মনে পড়ে গেল। আমরাও তো ঐভাবেই মুখস্থ করেছি।

—আপনারাও কি বাবাদের মতো 'লেফটেনেন্ট'-এর ইংরাজী বানান মনে রাখতে বলতেন 'মিথ্যে তুমি দশ পিঁপড়ে ?' অন্তু অবাক চোখে জিজ্ঞাসা করলো।

—নাতো ! ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দাও। সরমাদি বললেন।

—বলছি। 'মিথ্যে' হল   'তুমি' হচ্ছে (ইউ) 'দশ' হচ্ছে   আর 'পিঁপড়ে' হলো   । সবগুলো যোগ করলেই হয়ে যাবে   ।

—তবেই দেখ, বানান মনে রাখার জন্যেও কেমন মজার কায়দা বের করে নেওয়া যায়। সরমাদি হেসে বললেন।—অঙ্কের ব্যাপারস্যাপার মনে রাখার জন্যেও মজার মজার কায়দা আছে। আমার মনে পড়ছে—ছোটবেলায় ভগ্নাংশের অঙ্ক কষতে গিয়ে আমরাঅনেকেই 'লব' আর 'হরকে' গুলিয়ে ফেলতাম। ভগ্নাংশের উপরের রাশিটাকে 'লব' বলে না নিচের রাশিটাকে 'লব' বলে তা ঠিক করতে না পেরে প্রায়ই অঙ্ক ভুল করে বসতাম। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাদের স্কুলের অঙ্কের দিদি বললেন—বলতো রামায়ণের লব-কুশের মধ্যে কে বড় ? আমরা সবাই চেঁচিয়ে বললাম—লব বড়। দিদি বললেন—ঠিক। এখন 'বড়' যে সেই তো থাকে মাথার ওপর। তাহলে ভগ্নাংশের ওপরের রাশিটা হবে লব।

বুঝলে অন্তু, এই ভাবে মনে রাখার ফলে লব-হর নিয়ে আর কখনও গণ্ডগোল হয়নি।

অন্তু শুনছিল। সরমাদি বললেন—মনে রাখার আর একটা কায়দা তোমাকে বলি। ধরো তুমি বাজারে যাচ্ছ, মা বললেন—অন্তু বাজার থেকে মাছ, তরিতরকারী বুঝে আনবি, আর সেইসঙ্গে একটা গায়ে মাখার সাবান। হাফ কিলো বাদাম তেল, আড়াইশো গুড়ো হলুদ আর এক ডজন কলাও আনিস। বাড়ী ফেরার সময় কয়লার দোকানে একটা .খবর দিয়ে আসিস—এক মন কয়লা যেন পাঠায়। এখন তুমি তো বাজারে গেলে, মাছ তরিতরকারী কিনলে তারপরেই দেখলে বাকী সব জিনিযগুলোর কথা মনে পড়ছে না। হয়তো সাবান আর কয়লার কথা মনে পড়লো, বাকীগুলো কিছুতেই মনে এলো না। এমন তো হয়?

অন্তু বললো—হয় না আবার! বাবার সঙ্গে তো মার এই নিয়েই রোজ খিটিমিটি।

—এগুলো মনে রাখার সহজ কায়দাটা বলি। বাজারে যাওয়া মানে তো রান্নার কথাটাই মনে আসে সবার আগে। তা বে বানর আগে রান্নাঘরটার দিকে ভাল করে তাকাও। মা হলুদ আনতে ব ছে—রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখ হলুদ রঙের কিছু দেখতে পাও কিন । দেওয়ালের রঙ হলুদ হলে তো কথাই নেই। আর রান্নাঘরের দে ়য়াল মানেই তো তেল চিটচিটে; দেওয়াল পরিষ্কার করতে হবে—সাবান দিয়ে। অবশ্য পরিষ্কার করেইবা কি হবে, কয়লার উনুনের ধোঁয়ায় তো আবার তো দেওয়াল নোংরা হবে, রান্নাঘরের দেওয়ালে নিশ্চয়ই বড়সড় হুক আছে। হুক থেকে অনায়াসেই দড়ি-বাঁধা কলার কাঁদি ঝুলতে পারে। এবার বাজারে গিয়ে যদি রান্নাঘরের দেওয়ালটা মনে করার চেষ্টা কর, তোমার মনে পড়বে উনুনের ধোঁয়া—তার মানেই কয়লার কথা। মনে পড়বে তেল চিটচিটে হলুদ দেওয়াল আর তা থেকে হলুদ, তেল আর সাবানের কথা, সেইসঙ্গে দেওয়ালের হুক—যা থেকে মনে পড়বে কলা কেনার কথা।

অন্তু বললো—দারুণ মজা তো! বাবাকে বলবো—বাজারে যাওয়ার সময় আপনার ফর্মূলাটা পরীক্ষা করে দেখতে।

সরমাদি মাথা নেড়ে বললেন—উঁহু তোমার বাবাকে বলে লাভ নেই। উনি এত বেশী সিগারেট খান যে ও ফরমূলা ওঁর কোন কাজেই আসবে না।

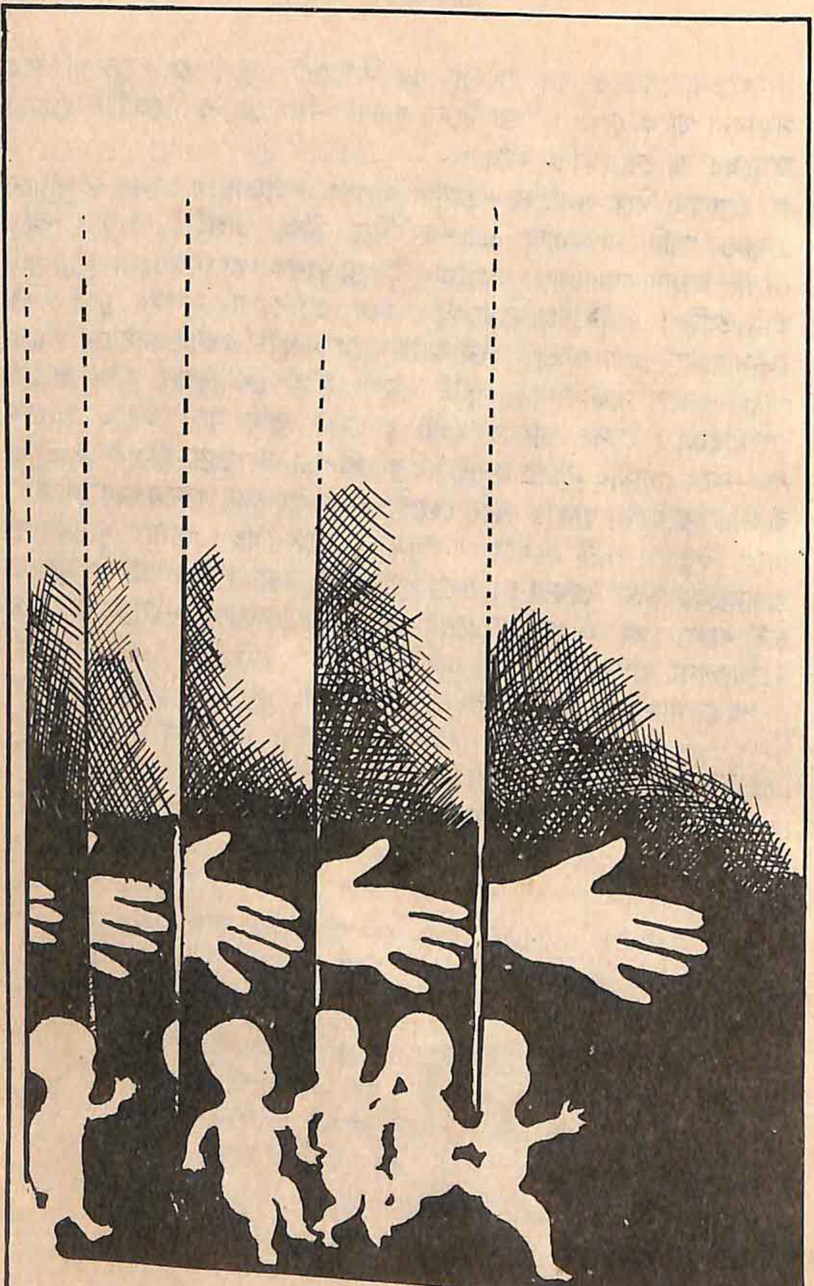
অন্তু বললো—সে কি! সিগারেট খেলে স্মৃতিশক্তি কমে যায় নাকি?

সরমাদি বললেন—তাই তো শুনছি। কিছুদিন আগে নাকি আমেরিকায় লস্এঞ্জেল্সের তিন বিজ্ঞানী, নামগুলো যতদূর মনে পড়ছে—হাউস্টন, জারভিক আর স্নেইডার, এরা তিনজনে একটা মজার পরীক্ষা চালিয়ে

দেখেছেন, কোনও কিছু শেখার পর সিগারেট খেলে তা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। বিজ্ঞানীদের ধারণা—সিগারেটের নিকোটিন হয়তো মানুষের স্মৃতির ক্ষতি করে।

অন্তু মন দিয়ে শুনছিল, সরমাদি বললেন—আমরা যে অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না—এটা একদিক দিয়ে কিন্তু ভালই। খেয়াল করে দেখ—আমরা সাধারণতঃ অপ্রয়োজনীয় বা দুঃখকর ব্যাপারগুলো ভুলে যাই তাড়াতাড়ি। একটু চিন্তা করলেই দেখবে, ছোটবেলার সুখকর স্মৃতিগুলিই তোমার মনে এখনও ভীড় করে আছে। যেমন তুমি এখনই আমাকে বলতে পারো—কবে, কোন বছর তুমি পড়াশুনা বা খেলাধূলার জন্য প্রাইজ পেয়েছিলে। অথচ হাজার চেষ্টা করলেও তুমি মনে করতে পারবে না—কবে তোমার মাষ্টার মশাইয়ের কাছে পড়া না পারার জন্য কড়া বকুনী বা মার খেয়েছো। রাস্তায় কোন ছেলে তোমায় অপমান করলে বা গালাগালি দিলে কিছুদিন পরই দেখবে বেমালুম তা ভুলে গেছ। আসলে দুঃখের বা অপমানের ঘটনা আমরা চট করে ভুলে যাই, হয়তো নিজেরাই তা ভুলতে চাই বলে। তা না হলে, দুঃখের স্মৃতি বয়ে বেড়ানো—সেও তো কম দুঃখের নয়।

অন্তু মাথা নেড়ে বললো—সত্যিই তো।



বুদ্ধির মাপ—আই-কিউ

সরমাদি ঘরে ঢুকেই বললেন—কি রেডি তো ? অন্তু একটু হাসলো। 'ফটোসিনথেসিস' চ্যাপটার থেকে যে কোন প্রশ্নের উত্তর ওকে লিখতে হবে আজ। আগের দিন সেই রকমই বলে গিয়েছিলেন সরমাদি। সেই প্রশ্নগুলিই ঠিক করতে টেবিলের ওপর থেকে জীবন-বিজ্ঞানের বইখানা যেই টেনে নিয়েছেন, অন্তু ফস্ করে জিজ্ঞাসা করলো—কিভাবে আমরা নিজেদের বুদ্ধিটা বাড়াতে পারি সরমাদি ?

—হঠাৎ বুদ্ধি বাড়াতে চাইছো কেন ?

—না মানে, বুদ্ধি বাড়াতে কে না চায় ? অন্তু বলে ওঠে।—আমাদের ক্লাসের গোবিন্দর কথাই ধরুন। আমাদের কে ছোটখাটো দেখতে—ওকে দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে ও ক্লাস নাইনে পড়ে। তা সে যাক্‌গে, বেচারার বুদ্ধি কম বলেই বোধহয় ক্লাসে পড়াটড়া ঠিকমতো বুঝতে পারে না। আজ তো অঙ্কের মাষ্টারমশাই বলেই বসলেন, 'তোমার তো বাপু মাথার ভেতর দেখছি শুধুই গোবর—তুমি এক কাজ কর বরং—রোজ একটু করে ব্রাহ্মী শাক খাও। তাতে যদি বুদ্ধিটা তোমার খোলে।'...

—সে কি, এতদিন তো জানতাম ব্রাহ্মীশাক খেলে নাকি স্মৃতিশক্তি বাড়ে, আজকাল ওতে বুদ্ধিও বাড়ছে নাকি ? সরমাদি বেশ অবাক হয়েছেন বোঝা গেল। অন্তু বললো—তাই তো বলছি, বুদ্ধি বাড়ানোর সত্যিকারের কায়দাটা বলে দিন না।

—সত্যি কথাটা বলবো ? সরমাদি হেসে ফেললেন।—বুদ্ধি জিনিষটাই আসলে বাড়ানো যায় না—এটা অনেকটাই জন্মগত—অবশ্য মানুষের বুদ্ধি কম-বেশি হওয়ার ব্যাপারে একেবারে ছোটবেলায় বাড়ী অথবা স্কুলের পরিবেশের অনেকটা হাত থাকে ! তবে হ্যাঁ, পরীক্ষায় দেখা গেছে কোন শিশুর ৭ বছর বয়েসে যে পরিমাণ বুদ্ধি থাকে তা থেকে সঠিকভাবে বলে দেওয়া যায় যে বড় হলে অর্থাৎ, তার বয়স ২০ যখন কিংবা ৪০ হবে তখন তার বুদ্ধিটা কেমন হবে। আসলে জন্মের পর থেকে বুদ্ধির হেরফের হতে হতে সাত বছর বয়সে এসে শিশুটির সারা জীবনের বুদ্ধির প্যাটার্নটা তৈরী হয়ে যায়।

অন্তুর কাছে এ কথাগুলো নতুন। সরমাদি একটু থামতেই ও জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা, কথায় কথায় আজকাল যে অনেকে 'আই-কিউ' পরীক্ষার কথা বলে—'আই-কিউ' মানেই তো বুদ্ধি, তাই না ?

—উঁহু, আই-কিউ বা বাংলায় যাকে বলে 'বুদ্ধ্যঙ্ক' তা হলো বুদ্ধির পরিমাপ। আমরা যেমন দুধ মাপি লিটারে কিংবা জামা-কাপড় মাপি মিটারে—বুদ্ধি আর 'আই-কিউ'র ব্যাপারটাও সেইরকম।

—তাহলে 'বুদ্ধি' বলতে আসলে কি বোঝায় ? অন্তু যে খানিকটা হকচকিয়ে গেছে ওর প্রশ্ন থেকে তাপরিষ্কার।

—ভারী কঠিন প্রশ্ন। সরমাদি নড়েচড়ে বসলেন।—মনোবিজ্ঞানীদের এক একজন 'বুদ্ধি'র এক এক রকম সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। যেমন কেউ বলেছেন, বুদ্ধি হলো মানুষের মনের একটা বৈশিষ্ট্য যার সাহায্যে নতুন অজানা পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা মানুষ কি করে। যেমন তুমি স্কুল ছুটির পর একদিন বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখলে, বাস চলছে না। ধরো, এরকম ঘটনা তোমার স্কুলজীবনে হয়তো কখনও ঘটেনি। এখন এই নতুন পরিস্থিতিতে তুমি কি করবে ? তুমি হেঁটেই বাড়ী ফিরবে, না স্কুলে ফিরে গিয়ে বাড়ীতে খবর দেবার চেষ্টা করবে—সেটাই ঠিক করবে তোমার 'বুদ্ধি'।

অন্তু মন দিয়ে শুনছিল। সরমাদি বলে চললেন—মনোবিজ্ঞানীদের অনেকে আবার বলেছেন, বুদ্ধি হলো আসলে শিক্ষালাভের ক্ষমতা। কেউ কেউ বলেছেন, বুদ্ধি হলো অভিজ্ঞতাকে ঠিক ঠিক কাজে লাগানোর ক্ষমতা। বুদ্ধির এমন হাজারটা সংজ্ঞা আছে যাদের কোনটাই বেঠিক নয়। যাই হোক—বুদ্ধির সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতের মধ্যে অমিল থাকলেও, বুদ্ধি যে মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য সে ব্যাপারটায় বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই একমত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, বাবা-মার সঙ্গে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির দিক থেকে যথেষ্ট মিল থাকে। যমজ ভাই-বোনদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, শতকরা ৯০টা ক্ষেত্রেই তাদের বুদ্ধির পরিমাণ একই রকম হয়। তবে হ্যাঁ, যদি কোন বুদ্ধিমান ছেলে এমন পরিবেশে মানুষ হয় যেখানে আশপাশের লোকজন বুদ্ধিতে খাটো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো সেখানে ঢোকে না—দেখা যাবে সে ছেলের বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তার বিকাশ হচ্ছে না। এটা অনেকটা অব্যবহারের ফলে লোহায় মরচে ধরার মতো ব্যাপার।

—বুঝলাম। এবার তাহলে আই-কিউ, মানে ঐ বুদ্ধি মাপার ব্যাপারটা বলুন। সরমাদি থামতেই অন্তু বলে উঠলো।

—গত শতাব্দীর মাঝামাঝি মানুষের বুদ্ধি মাপার প্রথম চেষ্টা করেন যিনি তাঁর নাম—ফ্রান্সিন গাল্টন। ডারউইনের নাম তো শুনেছো, সেই ডারউইনের দূর সম্পর্কের ভাই ছিলেন গাল্টন—অঙ্ক আর প্রকৃতিবিজ্ঞানে ছিল ওঁর পড়াশোনা। উনি হঠাৎ মানুষের বুদ্ধি মাপার জন্য বানিয়ে বসলেন

একটা 'টেস্ট'—শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে 'অভীক্ষা'। সেই টেস্টের সাহায্যে তিনি মানুষের মাথার আয়তন, তার কাজ করার তৎপরতা, স্মৃতি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা, কব্জির জোর—এই জিনিষগুলোর পরিমাণ বের করে তা থেকে বলতে লাগলেন—মানুষটির বুদ্ধি কম না বেশি। এখন হয়তো ভাবতে মজা লাগবে, কিন্তু ১০০ বছর আগে গাল্টন সাহেবের মতো অনেকেরই ধারণা ছিল—বুদ্ধি জোরালো হতে হলে গায়ের জোরটাও বেশি হওয়া দরকার। যাইহোক, ১৮৮৪ সালে ফ্রান্সিস গাল্টনের তৈরী সেই 'ইন্টেলিজ্যান্স টেস্ট' দিয়ে বিলেতের নানা ধরণের ৯০০০ লোকের বুদ্ধি মেপে দেখা গেল—আর যাই হোক, বুদ্ধির দিক থেকে অন্ততঃ নামজাদা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন তফাৎ নেই। গাল্টন এবং তাঁর সহকর্মীরা হতাশ হলেন। ওঁরা বুঝলেন—মানুষের বুদ্ধি মাপার ব্যাপারে ওঁদের তৈরী নতুন অভীক্ষাটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? গালটন সাহেব ব্যর্থ হবার প্রায় বছর কুড়ি পরে বুদ্ধি মাপার সঠিক পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন ফ্রান্সের আলফ্রেড বিনে। আসলে ফ্রান্সের সরকারের কাছ থেকে বিনের কাছে নির্দেশ এসেছিল যাতে তিনি এমন একটা কায়দা বের করেন যার সাহায্যে স্কুলের পড়াশুনোয় পিছিয়ে-পড়া ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা করে নেওয়া যায়। এ কাজে বিনের সঙ্গী ছিলেন থিয়োডর সিমো নামে আর এক ফরাসী মনোবিজ্ঞানী। বুদ্ধির অভীক্ষা বানাতে গিয়ে বিনে প্রথমেই ঠিক করেছিলেন, এমন কতকগুলি প্রশ্ন রাখতে হবে যার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের যুক্তিবোধ এবং বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা যাচাই করা যায়। বুদ্ধি পরিমাপ করার স্কেল বা অভীক্ষা প্রথম তৈরী হয় ১৯০৫ সালে—পরে বিনে তা আবার সংশোধন করেন ১৯০৮ আর ১৯১১ সালে। ঐবছরই বিনে মারা যান, ফলে ওঁর এবং সিমোর তৈরী বুদ্ধি মাপার প্রথম অভীক্ষা—'বিনে-সিমো স্কেলে'র আর কোন পরিবর্তন হয়নি।

—মানুষের বুদ্ধি মাপার জন্যে এখনও কি ওই স্কেল ব্যবহার করা হয় ? সরমাদি থামতেই অন্তু জিজ্ঞাসা করে।

—উঁহু এখন সব নতুন টেস্ট বেরিয়েছে।

অন্তু যেন কি বলতে যাচ্ছিল, সরমাদি বললেন—আর কথা নয়, আগে 'ফটোসিনথেসিসে'র এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে ফেলতো দেখি, তারপর না হয় আবার বুদ্ধি নিয়ে পড়া যাবে।

অন্তু প্রশ্ন লেখার জন্য খাতা বাড়ালো সরমাদির দিকে।

ফটোসিনথেসিসের প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর চোখ বুলিয়ে সরমাদি

বললেন—তোমাকে তখন আলফ্রেড বিনে'র কথা বলছিলাম, তাই না অন্তু ? ওই বিনে-সাহেবই মানসিক বয়সের কথা প্রথম বলেন। উনি দেখিয়েছিলেন—একটা শিশুর শরীরের বয়স যেমন বাড়ে, তার মনের বয়সও সেই অনুপাতে যেমন, কোনও শিশুর বয়স যখন ১০ বছর তখন তার মনের বয়সও যদি ১০ বছর হয় তবে তার বুদ্ধি হলো সাধারণ ; যদি তার মানসিক বয়স হয় ৮ অর্থাৎ যদি সে খুব বেশী হলে ৮ বছরের শিশুর উপযোগী প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারে তবে বলা হবে—তার বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে কম। ঠিক তেমনিই ১০ বছরের শিশু যদি ১২ বছরের শিশুর উপযোগী প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দিয়ে দেয়, তবে বলা হবে তার বুদ্ধি সাধারণের তুলনায় বেশী।

আলফ্রেড বিনে ইনটেলিজ্যান্স টেস্ট বা বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী জন্য ৩ থেকে শুরু করে ১৫ বছর এবং তারও বেশী বয়সের ছাত্রছাত্রীদের বয়স অনুযায়ী আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করেন। বিনে সাহেবের বেছে নেওয়া এই সব ছাত্রছাত্রীর সকলেই ছিল তাদের স্কুলের মাষ্টারমশাই বা দিদিমণির মতে 'একদম সাধারণ' ; অর্থাৎ, এরা পরীক্ষায় ফেলও করতো না, আবার ভাল রেজাল্টও করতো না। দীর্ঘদিন ধরে এদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে বিনে সাহেব প্রত্যেক বয়সের ছাত্রছাত্রীর জন্য এমন কতকগুলি প্রশ্ন বেছে নেন যেগুলির উত্তর ঠিক ঐ বয়সের ছাত্রছাত্রীই দিতে পারে। যেমন, একজন তিন বছরের শিশুর জন্য যে প্রশ্নগুলি তিনি বানালেন তার একটা ছিল—সেই শিশুকে তার নিজের পদবী বলতে বলা। তেমনি চার বছরের শিশুকে যেসব প্রশ্ন করা হতো তার একটা হলো—একটা কাগজে দু'টো সরলরেখা টেনে তাদের মধ্যে কোনটা বড় আর কোনটা ছোট—তা বলতে বলা। যদি এমন দেখা যায়—কোন পাঁচবছর বয়সের শিশু তার নিজের পদবী বলতে পারলো কিন্তু দু'টো সরলরেখার মধ্যে কোনটা বড় বা ছোট তা বলতে পারলো না—অর্থাৎ সে তিন বছরের শিশুর উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেও, চারবছরের শিশুর উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না—তাহলে সেক্ষেত্রে শিশুর আসল বয়স ৫ হলেও, তার মানসিক বয়সকে ৩ ধরা হবে। অর্থাৎ ছেলেটির বুদ্ধি কম—অথবা বুদ্ধির দিক থেকে সে পিছিয়ে-পড়া শিশু।

—বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নমালা তৈরী করতে হলেই তো হয়েছে—তার মানে তো বিনে সাহেবকে শ'খানেক টেস্ট বানাতে হয়েছিল ! অন্তু অনেকক্ষণ চুপচাপ শোনার পর প্রশ্ন করে।

—না, না, তা নয়। সরমাদি বলে ওঠেন। একটু আগেই বলেছি, তিন বছরের শিশুদের দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন। ঐ তিন থেকে শুরু করে পনের বছর বয়সের কিশোর—আলাদা আলাদা বয়সের উপযোগী করে

তৈরী হলো আলাদা আলাদা প্রশ্নমালা। পনের বছরের চেয়ে বেশী বয়স যাদের—এমন সকলের জন্য তৈরী হলো—একটা 'কমন্' প্রশ্নমালা। আসলে তখন ধারণাটা ছিল—পনের বছর বয়সের পর মানুষের বুদ্ধির আর কোন হেরফের হয় না। ধারণাটায় যে খুব একটা ভুল ছিল তা অবশ্য নয়। বছর দশ-বারো আগে মনোবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন—২৬ বছর বয়স অবধি মানুষের বুদ্ধি ক্রমশঃ বেড়ে চললেও, ১৫/১৬ বছরের পর বুদ্ধি বাড়ার হার খুবই সামান্য। ২৬ থেকে ৩৬—জীবনের এই ক'টা বছর মানুষের বুদ্ধি মোটামুটি একইরকম থাকে।

—আর তারপরই তা আবার কমতে শুরু করে নাকি ? অন্তু বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—ঠিক তাই ; যদিও বাবা-জ্যাঠার মতো কোন বয়স্ক লোককে যদি বলা হয়—আপনার বুদ্ধি আগের চেয়ে কমে গেছে, তিনি হয়তো রেগেই যাবেন—তবুও কিন্তু ব্যাপারটা সন্দেহাতীত ভাবে সত্যি। তবে হ্যাঁ—'বুদ্ধি কমা'র ব্যাপারটাও এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম। যেসব মানুষের স্বাস্থ্য ভাল, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় যুক্ত থাকেন—সেইসব বুদ্ধিজীবী মানুষের বুদ্ধি তাঁদের ৭০ বছর বয়সেও ৩৬ বছরের তুলনায় সামান্যই কমে। অন্যদিকে মাঝবয়সী মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে—হার্টস্ট্রোক বা হৃদরোগ হলে, কিংবা মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের পরিমাণ হঠাৎ কমে গেলে—তাঁর বুদ্ধিও অবিশ্বাস্য ভাবে কমে যায়!

সরমাদি থামলেন। হাত ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে বললেন—ইস্ অনেক রাত হয়ে গেল, এবার তো উঠতে হয়। 'বুদ্ধি' নিয়ে আরও অনেক মজার ব্যাপার আছে—সে সব বলতে গেলে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং ওঠার আগে 'বুদ্ধ্যঙ্ক' বা 'আই-কিউ'র ব্যাপারটা বলি।

—আগেই বলেছি, মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে আর থিয়োডর সিঁমো বুদ্ধি পরিমাপের জন্য ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম যে অভিক্ষাটি তৈরী করেন তাতেই মানসিক বয়সের কথা প্রথম বলা হয়। বিনে মারা যাবার পর ১৯১৬ সালে বিনে-সিঁমো স্কেল সংশোধন করেন আমেরিকায় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এল· এম· টারমান। ১৯৩৭ সালে ঐ টারমান সাহেবই তাঁর সহকারী এম· এ· মেরিলের সাহায্যে দ্বিতীয়বারের জন্য তা আবার সংশোধন করেন এবং অভীক্ষার প্রশ্নসংখ্যাও অনেক বাড়ান। বুদ্ধি পরিমাপের জন্য তৈরী ঐ নতুন অভীক্ষার নাম দেওয়া হয়—'টারমান-মেরিল স্কেল'। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং তা দারুন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সরমাদি একটু চুপ করতেই অন্তু বলে ওঠে—আপনি 'আই-কিউ'র ব্যাপারটা বলবেন বলছিলেন···।

—হ্যাঁ, সেটাই তো বলতে যাচ্ছি। সরমাদি শুরু করেন।—টারমান সাহেব বিনে-সিমোর স্কেলের আমূল সংস্কার যেমন করেন, তেমনই—বুদ্ধির পরিমাপক হিসেবে 'বুদ্ধ্যঙ্ক' চালু করেন। অবশ্য বুদ্ধ্যঙ্কের ধারনাটা তিনি নিয়েছিলেন জার্মান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম স্টার্নের কাছ থেকে। বুদ্ধ্যঙ্কের যে গাণিতিক সংজ্ঞা তিনি দিয়েছিলেন তা হলো ঃ

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক (আই-কিউ)} = \frac{\text{স্বাভাবিক বয়স}}{\text{মানসিক বয়স}} \times ১০০$$

অর্থাৎ, যদি ১০ বছরের কোন ছেলে ১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে—তবে তার স্বাভাবিক বয়স ১০ হলেও মানসিক বয়স হবে ১২, এবং তার **Intelligence quotient (IQ)** হবে (১২/১০)× ১০০ বা ১২০। দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে—সাধারণ মানুষের শতকরা ৪৬ জনের আই-কিউ ৯০ থেকে ১১০ এর মধ্যে। শতকরা ৩ জনের আই-কিউ ১৩০ বা তারও বেশী। তেমনই আবার সাধারণ মানযের শতকরা ৩ জনের আই-কিউ ৭০ বা তারও কম।

সরমাদি একটু থেকে আবার ঘড়ি দেখলেন, তারপর বললেন—টারমান-মেরিল স্কেল দিয়ে বুদ্ধ্যঙ্ক বের করার পদ্ধতি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও—বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এই স্কেল খুব একটা কার্যকরী হয়নি। তাছাড়া দেখা গেল, শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ যে সব শিশু বেশী পেয়েছে তারাই এই অভীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনোবিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই বুদ্ধি মাপার জন্য ভাষাবর্জিত বেশ কিছু টেস্ট তৈরী করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যাতে মূলতঃ ছবির মধ্যে দিয়ে নানা ধরনের ধাঁধা সমাধানের ব্যবস্থা থাকবে। ইতিমধ্যে ১৯৩০ দশকের শেষের দিকে একদল মনোবিজ্ঞানী নিউইয়র্কের বেলেভ্যু হাসপাতালের ডাঃ ডেভিড ওয়েসলারের নেতৃত্বে বয়স্ক মানুষদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য এক নতুন অভীক্ষা তৈরী করলেন—যার নাম 'ওয়েসলার অ্যাডাল্ট ইনটেলিজ্যান্স স্কেল' বা সংক্ষেপে WAIS। ১৬ বছরের চেয়ে বয়স বেশী যাদের—তাদের বুদ্ধি মাপার জন্য এখনও ভালভাবে এর ব্যবহার হচ্ছে।

সরমাদি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—বাকীটা পরের দিন বলবো।

কম বুদ্ধি-বেশী বুদ্ধি

উফ্, একে এই কাঠফাটা গরম—তার ওপর লোডশেডিং ! নাঃ, এবার নির্ঘাৎ লোকজন সব পাগল হয়ে যাবে ! ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সরমাদি বললেন।

হ্যারিকেনের আলোয় টেবিলের ওপর বইখাতা গুছিয়ে রাখছিল অন্তু। সরমাদিকে দেখে হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললো—দুপুর থেকে কারেন্ট নেই। আজ নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি চলে আসবে।

—ইস, তুমি যে দেখছি একেবারে ঘেমে নেয় গেছ! দাঁড়াও হাত-পাখাটা নিয়ে আসি। মাও যে সরমাদির পেছন পেছন ঘরে ঢুকেছে তা দেখতেই পায়নি অন্তু। সরমাদি যেন লজ্জা পেলেন, বললেন—না না, তার দরকার নেই মাসীমা। আমরা বরং বারান্দায় গিয়ে একটু বসি।

অন্তু মুচকি হেসে বললো—বইগুলো তাহলে এখানেই থাক্। "বুদ্ধির ব্যাপারস্যাপার" নিয়ে আরো বলবেন বলেছিলেন আজ।

সরমাদি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন—আগের দিন 'বুদ্ধি' নিয়ে কি কি বলেছি বলতো দেখি।

অন্তু চোখ বুজে সরমাদির গতদিনের কথাগুলো চিন্তা করতে করতে বললো—বুদ্ধি হলো মানুষের মনের একটা বৈশিষ্ট্য যার সাহায্যে কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হরে মানুষ তা ঠিক করে। 'বুদ্ধি'র অবশ্য আরও অনেক ডেফিনিশন আছে। 'বুদ্ধি' জিনিষটা অনেকটাই জন্মগত, আর ১৫—১৬ বছর বয়সের পর তা বিশেষ বাড়ে না বরং বেশী বয়সে আগের তুলনায় কমে আসে। কার বুদ্ধি কেমন তা বোঝা যায় তার আই-কিউ বা বুদ্ধ্যঙ্ক থেকে। অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্ক হলো বুদ্ধির পরিমাপক। মানুষের বুদ্ধি মাপার জন্য প্রথম 'টেস্ট' তৈরী করেছিলেন 'আলফ্রেড বিনে' নামে এক বিজ্ঞানী। পরে অবশ্য নানা বয়সের ছেলেমেয়ে এবং বয়স্ক লোকেদের বুদ্ধি মাপার জন্য আলাদা আলাদা আই-কিউ টেস্ট বেরিয়েছে।

অন্তু একদমে কথাগুলো শেষ করতেই সরমাদি বলে উঠলেন—ফুলমার্কস্ ! আমি 'বুদ্ধি' নিয়ে যা বলেছি তুমি একেবারে তার পারফেক্ট সারাংশ করে দিয়েছ। যে সব 'বুদ্ধির অভীক্ষা' বা 'ইনটেলিজ্যান্স

টেস্ট'-এর কথা তোমায় বলেছি তা দিয়ে লোকেদের বুদ্ধি মাপতে হয় একজন একজন করে। বুদ্ধির এমন টেস্টও আছে যা দিয়ে একসঙ্গে ৫০, ১০০ বা ৫০০ লোকের 'বুদ্ধ্যঙ্ক' মাপা যায়। শুনলে অবাক হবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদলে ভর্ত্তির জন্য এ জাতীয় টেস্টের সাহায্যে সাড়ে সতেরো লক্ষ লোকের বুদ্ধি মাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় এক কোটিতে। এই সময়কার আই-কিউ টেস্টগুলির নাম ছিল 'আর্মি-আলফা' আর 'আর্মি-বিটা' টেস্ট। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন মিলিটারীতে যোগ দেওয়া আগে বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হয়—এবং সেগুলো আরো অনেক বেশী উন্নত।

সরমাদি থামতেই কাপ-ডিস হাতে মা'কে বারান্দার দিকে আসতে দেখলো অন্তু। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সরমাদি বললেন—'আই-কিউ' টেস্টের কথা তো বললাম—এবার বরং 'কমবুদ্ধি-বেশীবুদ্ধি ব্যাপারটা বলি। মনে আছে নিশ্চয়ই, আগের দিন বলেছিলাম—সাধারণ মানুষের শতকরা ৪৬ জনের আই-কিউ মাঝামাঝি—অর্থাৎ ৯০ থেকে ১১০ এর মধ্যে। শতকরা ৩ জনের আই-কিউ ১৩০ বা তার বেশী—অর্থাৎ, এরা হ'ল 'উন্নতবুদ্ধি সম্পন্ন'। তেমনি, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শতকরা ৩ জনের আই-কিউ এরা হলো 'স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন'। একটু খেয়াল করলে স্কুলে এই দু'ধরনের ছেলেমেয়েই তুমি দেখতে পাবে।

সরমাদি একটু থেমে চায়ের কাপে পরপর কতকগুলো চুমুক দিলেন, তারপর কাপডিসটা চেয়ারের তলায় নামিয়ে রেখে বললেন—'স্বল্পবুদ্ধি'দের আবার নানান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যাদের 'আই-কিউ' ৭০ এর সামান্য কম তারা অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখতে পারে—টাকা পয়সার হিসেবও কিছু কিছু করতে পারে। এইসব ছেলেমেয়েদের বাবা-মা যখন এই ধরনের বাচ্চাদের সাধারণ স্কুলে ভর্তি করেন, তখন বুদ্ধির জন্যই এরা আর পাঁচটা স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না, পড়া বুঝতে পারে না, ক্লাসের পরীক্ষায় বার বার ফেল করে। অথচ, এদের যদি ছোটবেলা থেকেই একটু বেশী যত্ন নিয়ে পড়া বোঝানো যায় কিংবা হাতের কাজ শেখানো যায় তবে এরাও একসময় স্বাবলম্বী হতে পারে। তবে যাদের বুদ্ধি একেবারেই কম—অর্থাৎ যাদের আই-কিউ ২০ থেকে ৫০ এর মধ্যে তাদের দিয়ে পড়াশুনো করানো একেবারেই অসম্ভব। বয়স যতই বাড়ুক, মানসিক বয়স এদের ৩ থেকে ৭ বছরের বাচ্চার মতই থেকে যায়। খুব চেষ্টা করলে এদের নিজের কাজগুলো—যেমন খাওয়া, জামাকাপড় পরা, স্নান করা, মুখ-হাত-পা ধোওয়া—এই সব শেখানো যায়।

—'মঙ্গোল বাচ্চা' কখনো দেখেছো অন্তু ? সরমাদি কথা থামিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন।

অন্তু মাথা নাড়ে।—না তো।

—মঙ্গোল বাচ্চাদের চোখদুটো হয় ছোট ছোট, চোখের পাতা পুরু ; মাথার পেছন এবং মুখের গড়ন চ্যাপটা ; প্রায় সবসময়েই এরা চোখ পিট্‌পিট্ করে।

—কেন সরমাদি ? অন্তুর চোখে মুখে বিস্ময়।

—বিশেষজ্ঞরা বলেন, মঙ্গোল বাচ্চাদের শারীরিক এবং মানসিক উপসর্গগুলির জন্য নাকি 'জিন্' এবং 'ক্রোমোজোম' সংক্রান্ত কিছু কিছু গণ্ডগোলই দায়ী। 'জিন'-এর গণ্ডগোলের জন্য এদের শরীরের মধ্যেকার পরিপাক-ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়—ফলে, এদের মস্তিষ্কের গঠন সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া স্বাভাবিক মানুষের কোষের মধ্যে যেখানে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টা ক্রোমোজোম থাকে—সেখানে মঙ্গোল বাচ্চাদের থাকে ৪৭টা।

জন্মানোর সময় শিশু মাথার আঘাত পেলে পরবর্তীকালে শিশুটির বুদ্ধির বিকাশ নাও হতে পারে। আবার অনেকে বলেন—যেসব বাড়ীতে পড়াশুনোর আবহাওয়া নেই, সেখানে কমবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের মাঝখানে বড় হতে গিয়ে অনেক শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ঠিকমতো হয় না। খোঁজ নিলে দেখবে, শহরের বস্তী অঞ্চলের শিশুরা আর্থিক কারণেই বই, খবরের কাগজ বা রেডিওর সঙ্গে প্রায় অপরিচিত থেকেই বড় হয়ে ওঠে। ফলে এখানে স্বাভাবিক শিশুর বুদ্ধিসুদ্ধিও অনেক সময় ভোঁতা মেরে যায়।

অন্তু চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। সরমাদি বললেন—আই-কিউ পরীক্ষা না করে শুধুমাত্র মানুষের হাবভাব, আচার-আচরণ দেখেও তার বুদ্ধি কম না বেশী তা খানিকটা বোঝা যায়। 'স্বল্পবুদ্ধি' ছেলেমেয়েরা যেমন পড়া বুঝতে পারে না, তেমনি নিজের থেকে কোনও নতুন অঙ্ক বা সমস্যার সমাধানও করতে পারে না। আবার অন্যদিকে, তোমাদের বন্ধুবান্ধব যাদের বুদ্ধি সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী, তারা দেখবে ক্লাসে মাষ্টারমশাইদের একঘেয়ে পড়ানোয় খুশি হয় না। অসংখ্য প্রশ্ন করে, অঙ্কে তুখোড় হয়—আর সবচেয়ে অদ্ভুত হলো—এরা কথায় কথায় মজা করতে পারে, ধাঁধা বানাতে পারে—এবং নানা ধরনের বই পড়তে ভালবাসে। প্রায়ই এদের প্রশ্নের ঠেলায় টিচাররা বিরক্ত হন, অযথা শাস্তিও দেন এদের। উন্নতবুদ্ধি-সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে অসুবিধের দিকটা হলো—নিজেদের এরা অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখে—সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঠিকমতো মিশতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধি মাপার জন্য বাজারে যে সব ইনটেলিজ্যান্স টেস্ট চালু রয়েছে সেগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যাও আছে। প্রথমত : কেউ যদি নিজের আই-কিউ জানার ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী না হয় তবে সে দায়সারা ভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। এতে তার সঠিক 'বুদ্ধ্যঙ্ক' জানা

যাচ্ছে না। তেমনি যদি কেউ আগে ঐ টেষ্টের প্রশ্নগুলো দেখে থাকে, বা তার উত্তর দিয়ে যাকে তবে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয় বারে উত্তর দেওয়ার সময় তার ভুলের সংখ্যা অনেক কম হবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার তার যে আই-কিউ বেরবে তাও তার বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ হবে না। এইচ· জে· আইশেঙ্ক-এর তৈরী অভীক্ষাটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রথমবার প্রয়োগের পর যে মানুষটির আই-কিউ বেরিয়েছে ১১০, একই অভীক্ষায় দ্বিতীয়বার তার আই-কিউ হয়েছে ১১৬ এবং তৃতীয়বার ১২০।

সরমাদি কথা শেষ করতেই ঝপ্ করে আলো চলে এলো। চেয়ার ছেড়ে পড়ার ঘরের দিকে এগোতে এগোতে অন্তু বললো—কিন্তু সরমাদি, আমাদের ক্লাসে এমন ছেলেও আছে—যারা ক্লাসের পড়াগুলো ঠিকমতো না বুঝলেও—স্রেফ কোশ্চেন অ্যান্সার মুখস্থ করে পরীক্ষায় দিব্যি ভাল রেজাল্ট করে। এদের আপনি কি বলবেন ?

সরমাদি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—এইসব ছেলেদের বুদ্ধি কম—এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। ভুলে যেও না—বুদ্ধি যাদের বেশী—তারাই ভাল মুখস্থ করতে পারে। তুমি যে ছেলের কথা বলছো, তার বুদ্ধি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও সে হয়তো পড়াশুনোয় তেমন মনোযোগী নয়—ক্লাসের পড়াশুনো বোঝার কোন চেষ্টাই সে হয়তো করে না।

অন্তু আর কথা বাড়ালো না।

বুদ্ধি নিয়ে আরও কিছু কথা

অন্তু বললো—তাহলে সরমাদি, আমরা সব ভোকাট্টা ! জাপানীরা সব্বাইকে টেক্কা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাত হয়ে গেল !

সরমাদি ভুরু কুঁচকে বললেন—তার মানে ?

যারা অন্তু আর সরমাদিকে চেনে না, চট্ করে তাদের বলে দিই, অন্তুর ভাল নাম—অতনু।

ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠেছে এবার—ওদের বাড়ীতে লোক বলতে বাবা, মা আর ও। সরমাদি সপ্তাহে দু'দিন অন্তুদের বাড়ীতে এসে অন্তুকে পড়িয়ে যান। প্রথম প্রথম সরমাদির কাছে পড়তে খুবই লজ্জা করতো—পরে অবশ্য সরমাদির এক নম্বর ভক্ত হয়ে গেছে ও। সরমাদিকে পছন্দ করার সবচেয়ে বড় কারণ—পড়া বুঝিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নানা মজাদার বিষয় নিয়ে সরমাদি আলোচনা করেন—অন্তুর কাছে যা গল্পের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়।

সরমাদির ভুরু কোঁচকানো দেখেই অন্তু বুঝলো, খবরটা সরমাদি শোনেননি। কিভাবে ব্যাপারটা সরমাদিকে জানানো যায় সেটা একটু ভেবে নিয়ে অন্তু শুরু করলো—খবরে প্রকাশ, বিশেষজ্ঞরা বিশদ্ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখেছেন, জাপানীদের গড় 'আই-কিউ' এখন পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতের তুলনায় ঢের বেশি। জাপানীদের আগে ঐ জায়গায় একচেটিয়া দখল ছিল মার্কিনীদের। কি করে জাপানীরা মার্কিনীদের টেক্কা দিয়ে বুদ্ধির দৌড়বাজিতে জিতে গেল—তা নিয়ে আমেরিকায় বিজ্ঞানীরা এখন যারপর নাই চিন্তিত।

অন্তুর কথা বলার ভঙ্গী দেখে সরমাদি হেসে ফেললেন। অন্তু বললো—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো ? কাগজে সত্যিই কিন্তু খবরটা বেরিয়েছে। আপনি পড়েননি সরমাদি।

সরমাদি বললেন—না, না, তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না। আসলে আমি ভাবছি, যেসব বিজ্ঞানীরা জাপানীদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে সার্টিফিকেট দিলেন তাঁরা কি পৃথিবীর সব দেশের মানুষের বুদ্ধি মেপে দেখেছেন ? অন্ততঃ আমাদের ভারতবাসীদের গড় আই-কিউ যে

বিজ্ঞানীদের জানা নেই তা হলফ্ করে বলতে পারি।

—তাই নাকি ? অন্তু বেশ অবাক হয়েছে বোঝা যায়।

—তবে তোমায় বলি শোন। সরমাদি শুরু করলেন।—বুদ্ধির ব্যাপারে জাতিগত তফাৎ-এর ব্যাপারটা নিয়ে এই ধরণের এক হৈ চৈ হয় বছর ১২ আগে। একসময় আমেরিকায় সাদা মানুষদের তুলনায় কালো এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু মানুষের পড়াশুনোর সুযোগ সুবিধে ছিল কম। ওদেশে সাদা কালোয় রেষারেষি তো আজকের নতুন ব্যাপার নয়, সেই কোন যুগ থেকে তা ওদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। যাই হোক, আমেরিকার কালো মানুষদের ছেলেমেয়েরা যে পড়াশুনোর ব্যাপারে তেমন সুবিধে সুযোগ পাচ্ছেনা—সে দিকটায় নজর গেল ওদেশের কর্তৃপক্ষের এবং ওঁরা এমন কিছু ব্যবস্থা নিলেন যাতে পড়াশুনোর ব্যাপারে সাদা-কালোরা সমান সুযোগ পায়। তা সত্ত্বেও কয়েক বছর পরে দেখা গেল সাদা ছেলেমেয়েরা কালোদের তুলনায় পড়াশুনোর ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে—পরীক্ষার ফলও ওদের অনেক ভালো হচ্ছে।

কেন এটা হচ্ছে সেটা বোঝাতে গিয়ে আর্থার জেনসেন নামে জনৈক বিশেষজ্ঞ ১৯৬৯ সালে লিখলেন—আমেরিকার সাদা ছেলেমেয়েদের তুলনায় কালোদের বুদ্ধি অনেক কম ; সেই কারণেই এরা পড়াশোনায় সুবিধে করতে পারছে না।

জেনসেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দেখালেন—সাধারণ বুদ্ধির পরীক্ষায় কালোরা সাদাদের তুলনায় দলগতভাবে অন্ততঃ ১০ থেকে ১৫ পয়েন্ট কম পাচ্ছে।

—বুদ্ধির পরীক্ষা বলতে, 'আই-কিউ' মাপার টেস্ট বা অভীক্ষাগুলোকে বোঝানো হচ্ছে—তাই তো ? অন্তু জানতে চায়।

—ঠিক তাই। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি দিয়ে দেখা গেল—সাদাদের তুলনায় কালো ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক বা আই কিউ ১০ থেকে ১৫ পয়েন্ট কম। জেনসেন বলতে চাইলেন, নেহাৎ জীনগত কারণেই এটা হচ্ছে ; অর্থাৎ বংশগতির জন্য কালো মানুষদের ছেলেমেয়েরা সবসময়ই কমবুদ্ধিসম্পন্ন হবে।জেনসেনের ঐ মত কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মেনে নিলেন না। ওঁরা দেখালেন, কালো এবং সাদা মানুষদের মধ্যে বাইরের চেহারা বা আচার আচরণের দিক থেকে যতই অমিল থাকুক না কেন—তাঁদের শরীরের মধ্যেকার জীনের গঠন বা আকৃতির মধ্যে তেমন কোন তফাৎ ধরা পড়ে নি। সুতরাং বংশানুক্রমের ধারায় কোন বিশেষ জাতের মানুষ অন্য জাতের তুলনায় কম বা বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন হবে—এমন কথা শরীর বিজ্ঞানীরা কোন সময়ই বলতে পারছেন না।

অন্তু মন দিয়ে সরমাদির কথাগুলো শুনছিল। সরমাদি একটু থামতেই

বললো—তাহলে বুদ্ধির পরীক্ষায় কালোরা সাদাদের চেয়ে কম নম্বর পেতো কেন ?

—এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা। ওঁরা বলেছেন—বুদ্ধি মাপার জন্য বিশেষ অভীক্ষা বা ইনটেলিজেন্স টেস্ট মূলতঃ তৈরী হয়েছিল সাদা মানুষদের উপযোগী করেই। ফলে সেগুলির সাহায্যে কালো ছেলেমেয়েদের যে 'আই-কিউ' বা বুদ্ধ্যঙ্ক বেরিয়েছে তা দিয়ে তাদের বুদ্ধির সঠিক পরিমাণ বের করা অসম্ভব।

সরমাদি এবার ঘড়ি দেখলেন। তারপর অন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন—আসলে কি জানো, শ'য়ে শ'য়ে বুদ্ধির অভীক্ষা বেরিয়েছে এখন। মুশকিলটা—হলো যে অভীক্ষাটা বাঙালী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ভাল খাটে—অন্য প্রদেশের বাসিন্দাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তা ঠিক মেপে বের করতে পারে না। পারবেই বা কি করে বলো ? ধরো, কোন বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করা হলো—রসগোল্লা আর বলের মধ্যে মিলটা কোথায় ? এমন যদি হয়, বাচ্চাটা কোনদিন রসগোল্লা চোখে দেখেনি—সে বলতেই পারবে না যে দুটো জিনিষই গোলাকার। সুতরাং বুঝতেই পারছো, পৃথিবীর সমস্ত জাতের সমস্ত মানুষের উপযোগী কোনও বুদ্ধির অভীক্ষা এখনও পর্যন্ত তৈরী করা সম্ভব হয়নি, আর যতদিন তা না হচ্ছে, পৃথিবীর কোন বিশেষ জাতের মানুষকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে সার্টিফিকেট দিলেও—বাকী সবাই কি তা কখনও মেনে নেয় ?



ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয় ?

সেবার অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন যা কাণ্ড হলো ! সন্ধ্যেবেলা বীজগণিত, পাটিগণিত আর জ্যামিতি, সব মিলেমিশে একাকার—সব অঙ্কই করা ছিল, তবু পড়তে বসে মনে হলো যেন কিছুই মাথায় ঢুকছে না । বুঝলাম, এবার নির্ঘাৎ ফেল ! যাই হোক, মনটন খারাপ করে তো শুয়ে পড়েছি, ভোর-রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম । বিশ্বাস করবেন না—চোখের সামনে অঙ্কের কোশ্চেন-পেপার ভেসে উঠলো ! সকালে উঠে স্বপ্নে দেখা অঙ্কগুলো ঝালিয়ে নিলাম । আমি তো জানতাম অঙ্কগুলো আসবেই । ভোরের স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয়, বলুন ?—একনাগাড়ে কথাগুলো বলে অন্তু সরমাদির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় ।

—এই ধরনের স্বপ্ন দেখার ঘটনা অবশ্য আখচারই শোনা যায় । কেউ হয়তো স্বপ্নে দেখলো তার পুরনো কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের মুখ ; কিংবা কেউ দেখলো—সে নিজে বা তার কোনও প্রিয়জন রোগ শয্যায় শুয়ে আছে । অনেকেরই বিশ্বাস—স্বপ্নটা যদি ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার আগে দেখা যায়, তবে তা নাকি মিলবেই । সরমাদি মুচকি হেসে বললেন ।

—তার মানে, এইসব বিশ্বাসের পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই ? অন্তু জানতে চায় ।

—না । সরমাদির সাফ জবাব ।—ভোরের স্বপ্ন কেন, কোনও স্বপ্নই যে আদপে সত্যি হবেই এমন কথা বলা যায় না ।

—কেন যায় না ?

—এই কেন'র উত্তর পেতে হলে আমরা স্বপ্ন কেন দেখি তার উত্তর জানতে হবে । তার মানেই বইখাতা বন্ধ করে তোমাকে একটা বড়সড় লেকচার শুনতে হবে ।

সরমাদি শুরু করেন ।

—স্বপ্ন কেন দেখি তা নিয়ে শারীর বিজ্ঞানীদের মতটা আগে জানা যাক । ওঁদের মতে—স্বপ্নের সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে । ঘুমের মধ্যে হয়তো জলতেষ্টা পেল কারো ; জলতেষ্টা পাওয়ার খবরটা পৌঁছলো মস্তিষ্কে । এরপর মস্তিষ্কের কারিগরীতে জলখাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে সে । এতে

জল খাওয়ার ইচ্ছে বা প্রয়োজনটা তার তখনকার মতো মিটে যেতে পারে। আবার কারো হয়তো হার্টের অসুখ আছে—সে স্বপ্ন দেখতে পারে—কেউ তার গলা টিপে ধরেছে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে স্বপ্নের পেছনে শারীরিক কারণ নিশ্চিত ভাবে কাজ করছে।

ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের কাঁপুনি, মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ, শ্বাস-প্রশ্বাস—এসব এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে নিখুঁত ভাবে মেপে ফেলা যায়। শারীরবিজ্ঞানীরা ঘুমকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন—একটাকে বলা হচ্ছে Rapid eye movement সংক্ষেপে REM মানে ঘুমের যে অবস্থায় চোখের তারা দ্রুত নড়াচড়া করে ; আর দ্বিতীয়টা হলো Non- rapid eye movement বা NREM অর্থাৎ ঘুমের যে অবস্থায় চোখের তারা থাকে স্থির। জানা গেছে, ঘুমের সময়টায় আমরা সাধারণতঃ স্বপ্ন দেখে থাকি। খুব ছোট্ট শিশুরা তাদের ঘুমের শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৭৫ ভাগ সময়ই থাকে অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার অবস্থায়। শিশুরা যে ঘুমের মধ্যে দেয়ালা করে তা ঐ স্বপ্নের জন্যই। ক্রমশঃ শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে ঘুমের পরিমাণ কমতে থাকে। দশ বছর বয়সের পর থেকে বাকী প্রায় সমস্ত জীবনটায় ঘুমের পরিমাণ এসে দাঁড়ায়—পুরো ঘুমটার কমবেশী ২৫ শতাংশে ; অর্থাৎ রাত্রে কেউ যদি ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোয় তবে তার মধ্যে ঘণ্টা দুয়েক কাটে অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার অবস্থায়। সাধারণতঃ ঘুমিয়ে পড়ার ৯০ মিনিটের মধ্যে বা স্বপ্নপর্ব শুরু হয়—১০ থেকে ১৫ মিনিট কাটে স্বপ্নের মধ্যে—তারপর ঘণ্টা দেড়েকের জন্য পর্ব—অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে তখন কোন স্বপ্ন নেই। তারপর আবার ১০/১৫ মিনিটের স্বপ্নপর্ব, পরে ঘণ্টা দেড়েকের বিরতি। এই ভাবেই চলে সারারাত—ভোরের দিকটা স্বপ্নপর্বটা একটু বেশীক্ষণ ধরে চলে আর ঠিক ওই সময়টায় ঘুম ভেঙে গেলেই স্বপ্নটাও তাই হুবহু মনে পড়ে যায়।

এতো গেল শারীর-বিজ্ঞানীদের কথা। এবার এসো দেখা যাক্—মনোবিজ্ঞানীরা কিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে আগে যাঁর নাম মনে আসে তিনি সিগমুণ্ড ফ্রয়েড—ভিয়েনার এই স্নায়ু বিশেষজ্ঞ পেশায় ছিলেন মানসিক রোগের চিকিৎসক। তাঁর রোগীদের দেখা স্বপ্নগুলোকে উনি মন দিয়ে শুনতেন—এবং সেইসব স্বপ্ন থেকে তাদের রোগের কোনও হদিশ পাওয়া যায় কিনা তারই চেষ্টা করতেন তিনি। ১৯০০ সালে তিনি 'ইনটারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস্'-নামে একটা বই লিখলেন এবং তাতে আমাদের মনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আন্‌কোরা নতুন সব কথা বললেন। যেমন ফ্রয়েড বললেন, আমাদের যে মনটাকে আমরা চিনি, বুঝি—অর্থাৎ যে মনটার মধ্যে 'ইচ্ছা', 'আবেগ' এসব জেগে ওঠে তা

হলো 'চেতন-মন'—সেই চেতন-মনের গভীরে থাকে আর একটা 'অবচেতন-মন'—যার অস্তিত্ব আমরা ক্বচিৎ কদাচিৎ টের পাই। আমরা যখন জেগে থাকি, যখন নানা কাজে ব্যস্ত থাকি তখন আমাদের ভাবনা, চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি—সবই থাকে চেতন মনের নিয়ন্ত্রণে। সেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, অমনি আমাদের অবচেতন-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের রূপ ধরে আমাদের চেতনার মধ্যে চলে আসতে চায়। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। ধরো, কোন একটা ছেলে ক্লাসে মাস্টারমশাই-এর কাছে খুব মার খেলো—তা সে পড়া না পারার জন্যেই হোক বা দুষ্টুমী করার জন্যেই হোক। ক্লাশের অতগুলো ছেলের সামনে মার খাওয়ার দরুণ মাষ্টারমশাই-এর উপর তার রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক—এবং ঐ রাগ থেকে মাষ্টারমশাই-এর কোনও ক্ষতি করার ইচ্ছে তার মনে জাগতেই পারে। আবার মাষ্টারমশাই-এর কোনো ক্ষতি করা যে অন্যায় সে জানে অতএব তার সেই অন্যায় 'ইচ্ছে'টাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাইবে সে। চেতন-মন থেকে 'ইচ্ছে'টাকে সরিয়ে সে নিল হয়তো, কিন্তু কখন যে সেই খারাপ 'ইচ্ছে'টা তার অবচেতন মনে গিয়ে বাসা বেঁধেছে তা সে নিজেই জানে না। সেদিন বাড়ী ফিরে রাত্রে ঘুমের মধ্যে সে হয়তো স্বপ্ন দেখলো ঃ চশমা পড়া এক পকেটমারকে ধরে বহুলোক পিটছে—লোকটার 'চশমা'টা যেন ঠিক তার সেই মাষ্টারমশাই-এর চশমার মতো। বুঝতেই পারছো, মাষ্টারমশাই-এর কোন ক্ষতি করার যে আকাঙ্খাটা ছেলেটির অবচেতন-মনে বাসা বেঁধেছিল—সেই আকাঙ্খারই পরিতৃপ্তি হলো স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। সেদিক থেকে 'স্বপ্ন' কাজ করলো ইচ্ছা পূরণের মাধ্যম হিসেবে। তোমার হয়তো মনে প্রশ্ন জাগছে—স্বপ্নে ছেলেটি তার মাষ্টারমশাইকে সরাসরি না দেখে—মাষ্টারমশাই-এর মতো চশমা পড়া এক পকেটমারকে দেখলো কেন ? ফ্রয়েডের মতে, এই ঘটনার পেছনে 'মনের প্রহরী'র কারসাজি থাকে। ঘুমের সময় চেতন-মন ঘুমিয়ে পড়লেও অবচেতন মনের ইচ্ছে আকাঙ্খাগুলো স্বপ্নের মধ্যে হুবহু উঠে আসতে পারে না মনের প্রহরীর বাধা দেওয়ার ফলেই। ব্যাপারটাকে আর একটু বুঝিয়ে বললে ঃ ছেলেটার চেতন মনের কাছে মাষ্টারমশাই-এর মার খাওয়ার চিন্তাটা অন্যায় পাপ, অথচ অবচেতন মন সেই জিনিষটাই চাইছে। এক্ষেত্রে অবচেতন-মন—চেতন-মনের সঙ্গে যেন খানিকটা সমঝোতা করেই মাষ্টারমশাইকে মারার ইচ্ছেটাকে নিয়ে এলো স্বপ্নের মধ্যে—মাষ্টারমশাই-এর চেহারাটায় কিছুটা রদবদল ঘটিয়ে ; তবে পকেটমারের চশমাটা মাষ্টারমশাই-এর মতন রাখলো, যাতে মিলও খানিকটা থাকে—এইভাবে অবচেতন-মনের ইচ্ছেটাও পূর্ণ হলো। আবার চেতন-মনের সঙ্গে মারপিটও বাঁধলো না। গণ্ডগোলটা যদি মাষ্টারমশাইকে

নিয়ে না হতো, যদি এমন হতো যে স্কুলে ঐ ছেলে তার এক ষণ্ডামার্কা সহপাঠীর কাছে অপমানিত হলো ; সে ক্ষেত্রে ছেলেটা সরাসরি ঐ ষণ্ডামার্কা সহপাঠীকেই মার খেতে দেখবে। এখানে ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারে চেতন আর অবচেতন মনের মধ্যে বিরোধটা তেমন বড় নয়।

আর এক ধরণের স্বপ্ন লোকে প্রায়ই দেখেই থাকে—যেগুলিকে বলা যেতে পারে ভয় বা উদ্বেগের স্বপ্ন। যেমন ধরো 'অমল নামে একটা ছেলের বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন ; ডাক্তারও বিশেষ ভরসা দিতে পারছে না। এ অবস্থায় বাবাকে নিয়ে অমলের মনে উদ্বেগ থাকাটা স্বাভাবিক। এই সময়েই হয়তো অমল স্বপ্ন দেখতে পারে—সে নিজে অথবা তার পরিচিত অন্য কেউ উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে ; পাহাড়ের চুড়োর বদলে তিনতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার স্বপ্ন সে দেখতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাবাকে নিয়ে তার উদ্বেগটাই স্বপ্নের মধ্যে একটু অন্য চেহারায় ফুটে উঠবে।

—কিন্তু আমার ঐ স্বপ্ন দেখাটা কি মিথ্যে ? একনাগাড়ে সরমাদির কথাগুলো শুনে যাওয়ার পর এতক্ষণে অন্তু মুখ খোলে।

—মিথ্যে বলি নি তো। সরমাদি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছেন। স্বপ্নের মধ্যে পরীক্ষার প্রশ্ন দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটাও মনোবিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। ধরো, পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে পরীক্ষার বিষয় নিয়ে তুমি পড়াশুনো করছো বা ভাবনাচিন্তা করছো। তার মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্ন তোমার ভাল তৈরী হয়েছে ; ঐ প্রশ্নগুলোই পরীক্ষায় আসুক এটাও তুমি মনে মনে চাও। স্বপ্নে তোমার ইচ্ছাপূরণ হলো—অর্থাৎ তুমি স্বপ্নে দেখলে ঐ প্রশ্নগুলোই এসেছে। পরের দিন পরীক্ষার হলে গিয়ে স্বপ্নে দেখা প্রশ্নগুলোকে তুমি পেতেও পারো, নাও পেতে পারো। প্রশ্নগুলো সবক'টাই যদি পরীক্ষায় ঠিক ঠিক পেয়ে যাও তবে সেটাকে নেহাতই কাকতালীয় ব্যাপার বলেই ধরতে হবে।

মনগড়া সব ব্যাপার-স্যাপার

ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর ব্যাগটাকে রেখে সরমাদি বলে উঠলেন—কিহে, কেমন ঘোরা হলো ?

গরমের ছুটি শুরু হতেই অন্তরা দিন দশেকের জন্য বেড়াতে গিয়েছিল কাশ্মীর, অন্তুর বাবা চারবছর অন্তর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অফিস থেকে টাকা পান। ওঁর এক বন্ধুর আগ্রহেই হঠাৎ করে এবার কাশ্মীর যাওয়া।...সরমাদিকে দেখে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অন্তু বললো—সত্যি বললে কাশ্মীর জায়গাটা তেমন কিছু না।

—মানে ? অন্তুর কথায় সরমাদি যেন অবাক হলেন।

—আসলে ছোটবেলা থেকেই তো শুনে আসছি, কাশ্মীর নাকি ভূস্বর্গ—তা আমার কিন্তু স্বর্গ টর্গ বলে মনে হলো না। জম্মু থেকে শ্রীনগর—সারাদিন ধরে বাসে বসে পাহাড় দেখতে দেখতে আমার তো বিরক্ত লাগছিল। তার ওপর দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি। তাছাড়া ডাললেক তো বেশ নোংরা—ওখানকার লোকগুলোও দেখতে যতই সুন্দর হোক—কাছে গেলেই গায়ের বোটকা গন্ধে...

সরমাদি হেসে ফেললেন। বললেন—'স্বর্গ' বলতে তুমি মনে মনে ভেবে রেখেছিলে—পারিজাত বনে রঙ-বেরঙের পাখী শিষ দিচ্ছে, মিষ্টি গানের রেশ ভেসে আসছে বাতাসে, কুলকুল শব্দ করে নদী বয়ে যাচ্ছে—এইসব ?

অন্তু কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সরমাদি বললেন—আসলে 'স্বর্গ' জিনিষটাই যে অলীক ! পুরাণের গল্পগাথায় আমরা স্বর্গের যে বর্ণনা পড়েছি—সত্যিই কি তা বাস্তবের সঙ্গে মেলে ? কাশ্মীর যাওয়ার আগে ঐ জায়গাটা নিয়ে তুমি মনের মধ্যে একটা ছবি এঁকে না নিলে কাশ্মীর তোমার কিন্তু দারুণ ভাল লাগতো।

—'কল্পনা' জিনিষটা তাহলে খারাপ। অন্তু বলে উঠে।

—আমি বুঝি তাই বললাম ? সরমাদি অন্তুর দিকে বড় বড় চোখে তাকান। —কল্পনা না থাকলে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকরা কিছু সৃষ্টিই করতে পারতেন না। বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ারদের কথাও ধরো না। নতুন কিছু তৈরী

করার সময়ে, তা সে নতুন একটা ওষুধই হোক বা যন্ত্রই হোক—তার একটা ছক মনের মধ্যে ওঁদেরও ঠিক করে নিতে হয়। এটাও তো কল্পনা। তবে হ্যাঁ, এ কল্পনা হঠাৎ করে মাথায় আসে না—এদের পেছনে থাকে কতকগুলো বাস্তব বিশ্বাস।

অন্তুর কাছে কথাগুলো কেমন খটমট লাগছিল, সরমাদি যেন তা বুঝতে পেরেই বললেন—তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। বছর কয়েক আগে মার্কিন বিজ্ঞানীরা পাইওনিয়ার নামে এক মহাকাশযান পাঠিয়েছেন একটা বিশেষ নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাক করে। বিজ্ঞানীরা এখন কল্পনা করছেন—ঐ মহাকাশযানটা ১৯৮৯ সাল নাগাদ আমাদের সৌর জগতের চৌহদ্দি অতিক্রম করে চলে যাবে। একটু চিন্তা করলেই বুঝবে এর সঙ্গে রূপকথার অলীক কল্পনার তফাৎটা কোথায়। এর পেছনে বিজ্ঞানীদের যেসব বিশ্বাসগুলি কাজ করছে তা হলো—গ্রহদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রভাবে মহাকাশযানটি বছরের পর বছর ধরে ছুটে চলতে পারে, বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই অঙ্ক কষে সৌরজগতের যে পরিধি বার করেছেন তা নির্ভুল, পাইওনিয়ারের যাত্রাপথে এমন কিছু পড়বে না যা তাকে ধ্বংস করতে পারে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সব বিশ্বাসগুলির মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি থাকে বলেই—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের কল্পনাগুলো বাস্তবে খেটে যায়।

সরমাদি যেন দম নিতেই একটুক্ষণ থামলেন, তারপর আবার শুরু করলেন—শিল্পী সাহিত্যিকদের কল্পনার মধ্যে বাস্তবতার চেয়েও অবশ্য সৌন্দর্যবোধটাই কাজ করে বেশী। ধরো কোন পটুয়া একটা মূর্তি বানাবেন। শুরুতেই তিনি মনে মনে কল্পনা করে নেবেন—তাঁর দেখা দারুণ সুন্দরী একটা মেয়ের মুখ—এটাকে কল্পনা না বলে প্রতিচ্ছবি বলা উচিত। মনের মধ্যে মেয়েটির সুন্দর মুখের একটি প্রতিচ্ছবি যেই ফুটে উঠলো, পটুয়া তখনই বসে গেলেন মূর্তির মুখে সেই প্রতিচ্ছবির আদল ফুটিয়ে তুলতে।

অন্তু চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল, সরমাদি বললেন—এ সবের বাইরেও আর এক ধরনের কল্পনা আছে—যাদের আমরা বলি দিবাস্বপ্ন। কথায় বলে না, 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা'—অনেকটা সেই রকম।

—জানেন সরমাদি, আমার এক বন্ধু আছে—ও বোধ হয় আপনার ঐ দিবাস্বপ্ন দ্যাখে।

—কি রকম, শুনি।

—না মানে, প্রায়ই আমার ঐ বন্ধুটি গল্প করে—ওর বাবা নাকি মস্ত সরকারী অফিসার, ওর জ্যাঠা নাকি কোন থানার দারোগা, ওর মামা নাকি বক্সিং চ্যাম্পিয়ান...। বললে বিশ্বাস করবেন, না, ক'দিন আগে হঠাৎ ওর মা

এলেন স্কুলে—এক মাষ্টারমশাই-এর কাছে শুনলাম—ওদের বাড়ীর অবস্থা নাকি খুবই খারাপ। বাবা ওর চিররুগ্ন, শয্যাশায়ী। ওর মা নাকি এসেছিলেন আমাদের হেডস্যারকে অনুরোধ করতে যাতে স্কুল থেকে ওকে কিছু টাকার একটা স্কলারশিপ্ দেয়। একবার ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে কি আন্দাজে মিথ্যে বলেছে ঐ ছেলেটা ?

অন্তু থামতেই সরমাদি বললেন—তোমার বন্ধুটি যে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কি জানো—ওর ঐ দিবাস্বপ্নের পেছনেও কতকগুলো নির্দিষ্ট কারণ নিশ্চয় কাজ করে এসেছে। খোঁজ করলে জানবে, ওর বাবা অসুস্থ বলে কাকা কিংবা অন্য কারো অনুগ্রহে হয়তো ও বড় হচ্ছে। হয়তো ওরই বয়সী কোনও ছেলেমেয়ের কাছে কখনো সখনো ওকে অপমান, উপহাস সহ্য করতে হয়েছে—আর সেই থেকেই হয়তো ওর মনে হয়েছে—ওর আশেপাশে শক্তিমান, ক্ষমতাবান লোকেরা যদি থাকতো তবে ঐ উপহাস সহ্য করতে হতো না। নিজের মনের ঐ ইচ্ছে মেটাতেই ও কল্পনায় নিজের বাবাকে বানিয়েছে জাঁদরেল অফিসার, জ্যেঠাকে থানার দারোগা আর মামাকে নামকরা বক্সার। ওর ঐ উদ্ভট কল্পনা বা দিবাস্বপ্ন—যাই বলনা কেন—তা যে ওকে একটা সুখের অনুভূতির মধ্যে রেখেছে—এটা হলফ করে বলতে পারি।

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে সরমাদি টেবিলের ওপর রাখা অঙ্ক বইটার দিকে হাত বাড়ালেন। অন্তু জিজ্ঞাসা করলো—কারা কল্পনা করতে বেশী ভালবাসে—বড়রা না ছোটরা ?

—নিশ্চয়ই ছোটরা। সরমাদি বললেন।—কেন দ্যাখোনি—ছোট ছোট ছেলেরা কেমন বারান্দার রেলিংগুলোকে মানুষ কল্পনা করে ঝগড়া করে, লাঠির বাড়ি মারে ? ছোট মেয়েরা কেমন পুতুলকে নিজের ছেলেমেয়ে ভেবে খাওয়ায়, জামা-কাপড় পরায়, ঘুম পাড়ায় ! আর ভাগ্যিস ছোটরা কল্পনাপ্রবণ—না হলে ছোটদের সামলাতে সামলাতেই যে বড়দের সারাদিন কেটে যেতো !

অন্তু মাথা নেড়ে বললো—সত্যিই তো।



আবেগ-অনুভূতির চাবিকাঠি

পড়ার টেবিলের সামনে বসে অন্তু আনমনে যেন কি ভাবছিল, সরমাদি ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলো—জানেন, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে স্কুলে ; ব্যাপারটা যত ভাবছি ততই অবাক লাগছে !

—ঘটনাটা কি শুনি। হাতব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে পাখার তলায় চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন সরমাদি।

—আমাদের ইতিহাসের মাষ্টারমশাই এমনিতে খুব ভাল লোক—পড়া না পারলে কোন ছেলেকে মারা তো দূরের কথা, বকতে পর্যন্ত দেখি নি কোনদিন। ইতিহাসটা এমন সুন্দর পড়ান যেন মনে হয় গল্প বলছেন। এমন হাসিখুশী লোকটা আজ কি প্রচণ্ড রেগে গেলেন—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আসলে হয়েছিল কি—উনি ক্লাসে এসেই আজ রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকাল নিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন। আমরাও সবাই শুনছিলাম। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে থার্ড বেঞ্চের একটা ছেলেকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন—বল্ তো—রাজা শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি ছিল ? একটু আগেই উনি বলছিলেন—কিভাবে রাজা শশাঙ্ক গৌড় জয় করে রাজধানী বানালেন কর্ণসুবর্ণতে ; যে ছেলেটিকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন সে কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারলো না। বোঝা গেল, ও পড়া শুনছিল না। ইতিহাসের স্যার তখন এগিয়ে এসে ছেলেটির কাছে দাঁড়াতেই দেখতে পেলেন—ছেলেটার বইখাতার পাশে একটা পাতলা গল্পের বই। স্যার বললেন—তুই গল্পের বই পড়ছিলি ? ছেলেটা মাথা নেড়ে বললো—না তো। ব্যাস্, স্যার যেন ক্ষেপে গেলেন। চুলের মুঠি ধরে ছেলেটাকে বেঞ্চি থেকে টেনে বার করে কি মার যে মারতে লাগলেন—আপনাকে কি বলবো ! ছেলেটার গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারছেন, আর চিৎকার করছেন—পড়া তো শুনছিলিই না, তার ওপর আবার মিথ্যে কথা ! চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আশপাশের ক্লাস থেকে কয়েকজন স্যার আর কিছু ছেলে ছুটে এলো।

আমাদের ক্লাসের সামনে ভীড়—কিন্তু ইতিহাসের স্যার নির্বিকার ভাবে মেরে চলেছেন—সে যে কি অমানুষিক মার—তা না দেখলে বোঝা যায়

না। তাই তখন থেকেই ভাবছি সরমাদি, অমন শান্তশিষ্ট স্যার হঠাৎ ওরকম পাল্টে গেলেন কেন ?

—এটা না বোঝার তো কিছু নেই। তোমরা সবাই যখন মন দিয়ে পড়া শুনছো, তখন তোমারই একজন বন্ধু ক্লাসের মধ্যে লুকিয়ে গল্পের বই পড়ছে—অর্থাৎ তোমাদের সকলের থেকে ওর আচরণটা আলাদা। ছেলেটির আচরণ ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে তোমাদের ইতিহাসের স্যারের মনে প্রচণ্ড রাগ সৃষ্টি করেছিল। রাগের পরিমাণটা খুব বেশী হওয়ার পেছনে ঠিক কোন্ কারণটা কাজ করেছে তা অবশ্য বলা মুশকিল ! এমন হতে পারে—তোমাদের ইতিহাসের স্যারের মনে মনে অহঙ্কার ছিল—তিনি খুব ভাল পড়াতে পারেন। সব ছাত্র তাঁর পড়ানোর কায়দা ভালবাসে, বুঁদ হয়ে তাঁর কথা শোনে। হঠাৎ আজ যখন তিনি দেখলেন, তাঁর কথা শোনার চেয়েও গল্পের বই পড়াটা কারো কাছে বেশী আকর্ষণীয়—তখন তাঁর সেই অহঙ্কারটায় ধাক্কা লাগলো ; ফলে রেগে ওঠাটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। আবার এমনও হতে পারে—তোমাদের স্যার মনে করলেন—বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছাত্রদের উনি কিছু বোঝানোর যে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তা বিফলে গেছে ; আর এটা তো দেখেছো, একটা কিছু করার চেষ্টা করছো—ধরো, সিঁড়ি ভাঙ্গা একটা অঙ্ক কষছো—দু'পাতা ধরে অঙ্কটা করার পর উত্তর মিললো না—অর্থাৎ তোমায় চেষ্টা ব্যর্থ হলো ; সত্যি বলো, কেমন রাগ হয় তখন !

—ঠিক বলেছেন ; অন্তু বলে উঠলো।—আমার এক বন্ধু আছে, জানেন—ঠিক ঐরকম রেগে যায়। ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে হয়তো লাটাই-এর সুতোতে জট বেঁধে গেল ; প্রথমে অবশ্য ও খানিকটা চেষ্টা করবে সুতোর জটটা খোলার জন্য ; তারপর না পারলেই পট্‌পট্ করে জটের জায়গার সুতোগুলো ছিঁড়ে ফেলবে—কত মাঞ্জা যে নষ্ট হয় ! একদিন তো সুতোর জটের ওপর রাগ করে লাটাইটাকেই আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেললো !

—আসলে কি জানো—'রাগ', 'দুঃখ', 'আনন্দ', 'ভয়'—এসবই হলো এক এক ধরনের আবেগ ! বিজ্ঞানীরা দেখেছেন—আবেগের সময় মানুষের চেতনা বিশেষ কোন বিষয়ে আবদ্ধ থাকার জন্য আশেপাশের কোনো কিছুতেই আর খেয়াল থাকে না। আজ যখন তোমাদের ইতিহাসের স্যার রেগে গিয়ে তোমার বন্ধুকে অমানুষিক মার লাগাচ্ছিলেন তখন পাশে ভীড় জমে গেলেও তাঁর সে ব্যাপারে কোনো চেতনাই সম্ভবতঃ জাগে নি। তাছাড়া আবেগের সময় সাধারণতঃ হাত-পা নিজের বশে থাকতে চায় না। ফলে কাউকে ধরে মারছেন তো মেরেই চলেছেন। তাছাড়া, আবেগ অনেক সময় আমাদের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাগের মাথায় তাই তো

তোমার বন্ধু লাটাই ভেঙ্গে ফেলে ; লাটাইটা ভাঙ্গলে যে ঘুড়ি ওড়ানোই বন্ধ হয়ে যাবে—সেই বোধটাই থাকে না তখন।

অন্তু একমনে শুনে যাচ্ছিল, সরমাদি একটু থেকে বললেন—তবে হ্যাঁ, রাগ হলে যে সবাই একই রকম আচরণ করবে এমন কোন কথা নেই। আবার, শুধুমাত্র মুখের ভাবভঙ্গী দেখে কোন মানুষের রাগ বা দুঃখ হয়েছে না আনন্দ হয়েছে তা বোঝা মুশকিল। সিনেমায় হয়তো দেখে থাকবে—একটা আবেগের দৃশ্যে নায়ক বা নায়িকা হাসছে না কাঁদছে তা বোঝাই যায় না। একটু চিন্তা করে দেখ—কান্না এবং হাসি—এই দুটোর ক্ষেত্রেই আমাদের মুখের ভাবভঙ্গী হয় প্রায় একরকম। শুধু তাই না, অতিরিক্ত আনন্দ বা হাসির সময় কান্নার মতই যে চোখে জল এসে যায় তা নিশ্চয় দেখেছো। এই ব্যাপারেই মনে পড়ছে—১৯২৪ সালে 'ল্যান্ডিস' নামে এক মনোবিজ্ঞানী—মুখের ভাবভঙ্গী দেখে কোন মানুষের বিশেষ কোন আবেগকে চেনা যায় কিনা তা জানার জন্য এক মজার এক্সপেরিমেন্ট করেন। কিছু মানুষকে গান শুনিয়ে, অ্যামোনিয়া শুঁকিয়ে, তাদের হাতের মধ্যে ব্যাঙ ছেড়ে দিয়ে, গায়ে বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে এবং আরও নানারকম উপায়ে তাদের মধ্যে আনন্দ, বিরক্তি, ভয় ইত্যাদি নানাধরনের আবেগ সৃষ্টি করা হয়। এক্সপেরিমেন্ট শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেকটি মানুষের মুখের বিভিন্ন অংশে কতকগুলো কালো দাগ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিটি আবেগের মুহূর্তে ওদের সকলের মুখের ফটো তুলে নেওয়া হয়। ওই সব ফটোগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, একই ধরনের আবেগে বিভিন্ন মানুষের মুখের পেশীগুলো বিভিন্ন ভাবে কুঁচকে ওঠে, ফলে প্রত্যেকটা লোকের মুখের ওপর যে দাগগুলো দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যেকার দূরত্ব এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম হয়। ১৯৪৬ সালে 'হেব' নামে আর এক মনোবিজ্ঞানী মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি স্তরের প্রাণী শিম্পাজীদের আবেগের ধরন-ধারন নিয়ে গবেষণা চালান। বহুদিন ধরে শিম্পাজীদের কাছাকাছি রয়েছেন এমন কিছু মানুষের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে 'হেব' ও সিদ্ধান্তে এলেন—মানুষের মত শিম্পাজীদেরও আবেগের বহিঃপ্রকাশ এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম।

অন্তু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সরমাদি চোখ পাকিয়ে কৃত্রিম রাগের ভঙ্গী করে পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে বললেন—আজ কি শুধু হাসি-কান্নার গল্পই হবে সারাক্ষণ ? ক্লাসের পড়াগুলো বুঝে নাও, তারপর বরং...।

সরমাদি কথা শেষ করার আগেই অন্তু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দিল।

● ● ●

ক্লাসের পড়া সব শেষ ; অন্তু বইগুলো সব গুছিয়ে রাখছিল, সরমাদি

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—মুখের ভাবভঙ্গী দেখে কোন লোকের আবেগ চেনা যে শক্ত ব্যাপার তা তখন তোমায় বলছিলাম। যে কোন ধরণের আবেগ—সে রাগ, দুঃখ, লজ্জা, ভয়—এ সব কিছুরই কিন্তু শারীরগত একটা দিকও আছে। যখনই আমাদের মধ্যে কোন আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে, যেমন অতিরিক্ত ভয় পেলে অথবা রাগ হলে শরীরের মধ্যে বেশ কতকগুলো পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, শরীরের বিভিন্ন গ্ল্যান্ড থেকে অতিরিক্ত হরমোন বেরোতে থাকে, রক্তচাপ বেড়ে যায়। এখন থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে ১৮৮৪ সালে উইলিয়াম জেমস্ নামে এক মনোবিজ্ঞানী আর ১৮৮৫ সালে কার্ল ল্যাঙ্গ নামে এক শারীরবিজ্ঞানী কিন্তু আবেগের ব্যাপার-স্যাপার বোঝানোর জন্য নতুন এক তত্ত্ব দাঁড় করালেন। ওঁরা বললেন, আবেগের জন্য যে শারীরিক পরিবর্তন হয়—এ ধারণাটা ভুল ; আসলে শরীরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন হলে মনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আবেগ জেগে ওঠে। অর্থাৎ আমরা ভয় পেলে যে কাঁপতে থাকি তা নয়, বরং কাঁপি বলেই ভয় পাই।

—তার মানে আপনি বলছেন, বনের মধ্যে বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়ে আমরা যে দৌড় লাগাই সেটা ভুল ; আসলে দৌড় লাগাই বলেই আমরা ভয় পাই?

—উহুঁ আমি কিচ্ছু বলিনি। এটা আসলে জেমস্-ল্যাঙ্গ তত্ত্ব ; ওঁদের বক্তব্য হলো—যেই তুমি বাঘের ডাক শুনলে অমনি তোমার শরীরের মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। শরীরের সংবেদনশীল স্নায়ুগুলো সে পরিবর্তনের খবর পৌঁছে দিল তোমার মস্তিষ্কে। এতে মস্তিষ্কে বিশেষ এক ধরণের উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। সেই উদ্দীপনা আবার অসংখ্য স্নায়ু মারফৎ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। এর ফলে সেইসব জায়গার মাংসপেশী বা গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো অর্থাৎ মুখের মাংসপেশীগুলো টান টান হয়ে গেল, ফলে চোখগুলো যেন আরও বড় বড় দেখাতে লাগলো, আমাদের মুখের মধ্যে যে লালাগ্রন্থি আছে তা থেকে লালা বেরোনোর পরিমাণ কমে গেল—ফলে গলা শুকিয়ে কাঠ ! শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বাঘের ডাকের প্রতিক্রিয়ার খবরটা আবার পৌঁছলো মস্তিষ্কে—ফলে 'ভয়' নামে এক বিশেষ ধরনের আবেগ সৃষ্টি হলো।

—ধ্যাৎ। এ হতেই পারে না। সরমাদি কথা শেষ হতে না হতেই অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে অন্তু বলে উঠলো।

সরমাদি হেসে ফেললেন। বললেন—জেমস্-এর কথার মধ্যে যে যুক্তি ছিল না তা নয়। উনি বললেন—আবেগ মাত্রই তার কোনো না কোনো দৈহিক প্রকাশ থাকবে। তাছাড়া অন্ধকারে কারো সঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা লাগলেই

যে বুক কেঁপে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যে বেড়ে যায় তা তো আমরা সবাই জানি। সেক্ষেত্রে কোনরকম ভয়ের ধারণা করার আগেই শরীরের মধ্যেকার পরিবর্তনগুলো ঘটে যায়। উন্মাদদের দেখিয়ে জেমস্ বললেন—ওরা যে অকারণে কাঁদে, হাসে—ওদের ঐ আবেগের পেছনে নিশ্চয়ই কোন দেহের ভেতরকার পরিবর্তন কাজ করে। তাছাড়া আবেগের বহিঃপ্রকাশকে যদি রোখা যায়—দেখা গেছে 'আবেগ'ও অমনি সরে পড়ে। খুব রাগের সময় রাগের বহিঃপ্রকাশগুলোকে চেপে রেখে দিলে, অর্থাৎ রাগের সময় কটমট করে না চেয়ে, দাঁত কিড়মিড় না করে শান্ত থাকার চেষ্টা করলে অল্প সময়ের মধ্যে রাগ পড়ে যায়।

অন্তু একমনে শুনে যাচ্ছিল। সরমাদি একটু চুপ করে থেকে বললেন—জেমস্-ল্যাঙ্গ যাই বলুন—তার মধ্যে যতই নতুন কথা থাক—আদতে তা কিন্তু ধোপে টিকলো না। ওঁদের সমালোচকরা বললেন—উন্মাদের হাসি-কান্নাকে তাদের আনন্দ বা দুঃখের চিহ্ন হিসেবে ধরলে ভুল করা হবে। উন্মাদের ক্ষেত্রে যেটাকে আবেগ বলে ভুল করা হয় সেটা আসলে আবেগের মেজাজ। যাই হোক, জেমস্-ল্যাঙ্গের মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো আক্রমণ এলো শেরিংটন নামে এক মনোবিজ্ঞানীর কাছ থেকে। তিনি একটা কুকুরের শরীরের সংবেদনবাহী স্নায়ুগুলোকে কেটে দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে মস্তিষ্কের যোগাযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিলেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু কুকুরটার মধ্যে রাগ, বিরক্তি, ভয়—এইসব দেখা গেল। এরপর অনেকটা একই পদ্ধতিতে বিড়ালদের আবেগ নিয়েও পরীক্ষা চালান আরও দু'জন বিজ্ঞানী। বিড়ালগুলোর বিশেষ বিশেষ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু যাদের ইংরাজীতে বলে Symathetic nerve এবং যাদের পথ ধরে মানুষ এবং বিভিন্ন পশু প্রাণীর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হওয়ার কথা—সেইসব নার্ভগুলি ওরা অপারেশন করে বাদ দিয়ে দিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার তারপরও বিড়ালগুলির মধ্যে রাগের লক্ষণ হিসেবে গর্জন করা, দাঁত দেখানো—এসব কিন্তু সমান তালে চলতে লাগলো। ক্যানন নামে ঐ দুই মনোবিজ্ঞানীর একজন—মানুষের শরীরে 'অ্যাড্রিনালিন' ইনজেকশন দিয়ে দেখালেন যে তাতে রক্তের চাপ বাড়ছে, নাড়ীর গতি বাড়ছে ; এককথায় রাগের সময় যেসব শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয় সেগুলিই দেখা দিচ্ছে। অথচ যে মানুষগুলোর ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয় তাঁরা কিন্তু সকলেই বলেছেন—তাদের মনের মধ্যে আদৌ কোনও রাগ তৈরী হয়নি। এই ধরণের নানা পরীক্ষা চালিয়ে কিছু মনোবিজ্ঞানী সিদ্ধান্তে এলেন যে মস্তিষ্কের 'থ্যালামাস' নামের অংশটাই প্রাণীদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আবেগ সৃষ্টির ব্যাপারে মস্তিষ্কের অন্য অংশের কিনা ভূমিকা আছে সে নিয়ে আরও উন্নত ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় ১৯৫০ সালের পর। ১৯৫৩ সালে জেমস্ ওল্ডস্ নামে এক বিজ্ঞানী ইঁদুরদের নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। ওঁর পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—ইঁদুরদের মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশকে ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বারের সাহায্যে উত্তেজিত করলে ইঁদুরদের মধ্যে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখা। পরীক্ষা চালাতে চালাতে একদিন হঠাৎ ওঁর ইলেকট্রোড গিয়ে স্পর্শ করলো Arterior Commissor নামে মস্তিষ্কের এক বিশেষ ধরণের স্নায়ুগুচ্ছকে, আর অমনি ইঁদুরগুলো এমন একটা ভাব দেখালো যাতে মনে হয় ব্যাপারটা ওদের খুব ভাল লেগেছে। এরপর যতবারই ইঁদুরদের ঐ বিশেষ স্নায়ুগুচ্ছকে উত্তেজিত করা হলো ততবারই যেন ওদের মধ্যে এ ধরণের সুখের অনুভূতি তৈরী হতে লাগলো। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন জন্তুজানোয়ারদের উপর এই ধরনের যে কত পরীক্ষা চালানো হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই! ১৯৬৪ সালের পর মানুষের মস্তিষ্কের Lymbic System -এর ওপরও এ জাতীয় পরীক্ষা চালিয়েছেন একাধিক বিজ্ঞানী এবং এ সমস্ত পরীক্ষা থেকে যে ব্যাপারটা আজ পরিষ্কার, তা হলো—মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের মস্তিষ্কে এমন এমন জায়গা সত্যিই আছে যা উত্তেজিত হলে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি হয়।

সরমাদি বাড়ী যাবেন বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অন্তু বললো—তার মানে, কোনো ব্যাপারে যখন মানুষ দুঃখে ভেঙে পড়ে—তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার বদলে তাঁর ব্রেনের বিশেষ স্নায়ুগুচ্ছকে উত্তেজিত করে তাঁর মনে সুখ এনে দেওয়াটাই মঙ্গল—তাই নয় কি?

সরমাদি হেসে ফেলে বললেন—আইডিয়াটা মন্দ না। কে জানে ভবিষ্যতে হয়তো তাই হবে।

শরীর মনের আঁতাত

কথা হচ্ছিল ভূগোল-স্যারকে নিয়ে। অন্তু বললো—জানেন, অমন খিটখিটে মানুষ আর হয় না। দেখলেই মনে হয়, ঠিক যেন ডিসপেপসিয়ার রুগী !

সরমাদি হাসলেন।—খিটখিটে রাগী মানুষরা সবাই বুঝি 'ডিসপেপসিয়ায় ভোগে ?

—না, তা হয়তো নয় ; তবে বহুদিন ধরে অসুখ বিসুখে ভুগলে লোকে কিন্তু একটু খিটখিটে হয়ে যায়। অন্তু জবাব দেয়।—কেউ কেউ আবার মনমরাও হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আমার এক মেসোমশাই তো কোনরকম অসুখ বিসুখ হলেই রীতিমতো আতঙ্কে ভুগতে থাকেন। দু'দিন মাথার যন্ত্রণা হলেই ভাবেন বুঝি ব্রেন-টিউমার হলো ; কিংবা একটু পেটে ব্যাথা হলেই ভাবেন—পেটে নির্ঘাৎ 'আলসার' হয়েছে !

—তোমার মেসোমশাই-এর তো অসুখ না হতেই আতঙ্ক। অবশ্য ক্যানসার জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে যাঁরা ভোগেন তাঁদের প্রায় সকলেই কমবেশী আতঙ্ক-উৎকণ্ঠায় দিন কাটান। অনেক সময় এর জন্য মানসিক রোগেরও শিকার হন তাঁরা। তবে কি জানো, এর উল্টোটাই ঘটে বেশী। অর্থাৎ, যাঁদের মনের মধ্যে আবেগ-উৎকণ্ঠা বেশী—শারীরিক অসুখ বিসুখে তাঁরাই ভোগেন বেশী। কিংবা ঘুরিয়ে বললে—মন প্রফুল্ল না থাকলে শরীরের অসুখও যেন সারতে চায় না।

—সেটা কেমন ? অন্তু জিজ্ঞাসা করে।

—তুমি কখনও হাঁপানীর রোগী দেখেছো ?

—আমার ছোড়দাদুরই তো হাঁপানী আছে। মাঝে মাঝে হাঁ করে শ্বাস নেন, যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। দেখে যে কি কষ্ট হয় কি বলবো !

সরমাদি একটু নড়েচড়ে বসেন, তারপর বলেন—দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, মানসিক অস্থিরতা বা উত্তেজনার জন্য যেসব অসুখের প্রকোপ নিশ্চিতভাবে বেড়ে যায় তাদের একটা হলো অ্যালার্জী-জনিত অসুখ—হাঁপানী। এটা প্রথম বুঝেছিলেন 'ত্রুশো' নামে এক ফরাসী চিকিৎসক। ভদ্রলোকের নিজেরই হাঁপানীর রোগ ছিল। একদিন নিজের গাড়োয়ানকে ঘোড়ার

আস্তাবল থেকে 'ওট' চুরি করতে দেখে তিনি রাগে দিশাহারা হয়ে যান। আশ্চর্যের ব্যাপার, গাড়োয়ানকে ধমকাতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর শ্বাসকষ্ট প্রচণ্ড বেড়ে গেছে—কোনও কথাই বেরোচ্ছে না মুখ থেকে! পরে ঘটনাটার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'শুধু আস্তাবলের ধুলোবালিই নয়, তার সঙ্গে মানসিক উত্তেজনা যোগ হওয়াতে হাঁপানীর টান অতটা বেড়ে গিয়েছিল।'

শুধু শ্বাসকষ্টই নয়, মানসিক অস্থিরতা বেশী হলে আমাদের শরীরে জীবাণু-সংক্রমণের আশঙ্কাও যে বেড়ে যায়—তা এখন আমরা জেনেছি। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ টানাপোড়েন চললে, কিংবা আতঙ্ক-উত্তেজনার মধ্যে অনেকটা সময় কাটলে অনেকেরই নাক সুড়সুড় করে, নাক দিয়ে জল ঝরে। ফলে, জীবাণু-সংক্রমণের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একটি মেয়ের কথা জানি, যে একবার ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছিল। সেইসময় একদিন টেলিভিসনে এক খুনের দৃশ্য দেখে আতঙ্কে তার হাঁপানীর অ্যাটাক হয়। পরে, সে হাঁপানীর ক্রনিক রোগী হয়ে গিয়েছিল।

অবাক-চোখে তাকিয়েছিল অন্তু; সরমাদি থা তেই বললো—মানসিক কারণে আর কি কি রোগ হয়?

—সে তো এক বিরাট লিস্ট তৈরী হবে। অ বরং দু'চারটে বড়সড় অসুখের কথা বলি। সরমাদি শুরু করেন —প্রথমেই মনে আসছে 'পেপটিক আলসারে'র কথা। জন্তুজানোয়ার তো বটেই, মানুষের ওপরও পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, অন্ত্রের দেওয়ালে যে ঝিল্লী-জাতীয় জিনিষ থাকে মানসিক চাপের সময় তার রঙ হয় টক্‌টকে লাল, সেইসঙ্গে পাচকরসের নিঃসরণও হঠাৎ করে অনেকটা বেড়ে যায়। ক্রমাগত এই জিনিষটা হতে থাকলে পেটের ভেতর যে ঘা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? শুধু কি তাই, আমাদের শরীরের ভেতর যে নানারকম হরমোনের নিঃসরণ হয়, তার বাড়াকমা যেহেতু মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, মাত্রাতিরিক্ত আবেগ বা উত্তেজনা থেকে নানা ধরনের চর্মরোগ, বাতজনিত অসুখবিসুখ, গাঁটে ব্যাথা, মাথা যন্ত্রণা, হৃদরোগ—এসব যে লেগে থাকবেই তাতে আর আশ্চর্য কি?

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে জলের গ্লাসটা টেনে নিলেন সরমাদি। অন্তু বললো—সত্যি, ভাবাই যায় না!

—তাহলে তোমায় বলি শোন। সরমাদি আবার শুরু করেন।—যে ক্যানসারকে নিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষের মাথাব্যাথার অন্ত নেই, তারও সূত্রপাত নাকি স্ফূর্তির অভাব থেকেই! হ্যাঁ, এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে

বিরাট হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল ১৯৭৮ সালে, বিজ্ঞান-পত্রিকা 'সায়েন্স'-এ যখন এরকম একটা নিবন্ধ ছাপা হয়।

ক্যানসারের সঙ্গে আমাদের মনের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে প্রথম চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় অবশ্য ১৯৪৬ সালে। ক্যারোলিন বেডেল-নামে এক মার্কিন মহিলা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন, যেসব মেয়েরা ক্যানসারে ভুগছেন তাঁদের মানসিক গড়নগঠন অনেকটা আত্মহত্যাপ্রবণ রোগিনীদের মতই। এর থেকে বেশী কিছু অবশ্য তিনি বলতে পারেননি তখন।

সাতের দশকের গোড়ার দিকে এই নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ডাঃ কিসেন। সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেন, হিসেবটা ঠিক মিলছে না। যাঁরা প্রচুর ধূমপান করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ক্যানসারকে এড়িয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন, অথচ এমন অনেক ফুসফুসের ক্যানসার রোগী পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা খুব অল্পই ধূমপান করেন। চললো নানা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষানিরীক্ষা। ডাঃ কিসেন দেখলেন যাঁরা সবসময়ই মনমরা হয়ে থাকেন, কোন ব্যাপারেই যাঁরা ঠিকমতো উৎসাহ পান না, তাঁরাই কিন্তু বেশী ক্যানসারের শিকার হন—যত কমই সিগারেট তাঁরা খান না কেন।

কিসেন-এর কাজের সূত্র ধরে পরীক্ষা শুরু করলেন শারীরবিজ্ঞানীরা—দেখলেন যাঁরা অল্প ধূমপান করেই ক্যানসারের কবলে পড়ছেন তাঁদের রক্তে একটা বিশেষ এনজাইম 'অ্যারাইল হাইড্রোকার্বন হাইড্রক্সিলেজের' পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী। বিজ্ঞানীরা বললেন, এই এনজাইমের কাজ হচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে যে হাইড্রোকার্বন ফুসফুসে যাচ্ছে, সেই যৌগকে পরিবর্তিত করে ক্যানসার সৃষ্টিকারী এক নতুন যৌগের জন্ম দেওয়া। আশ্চর্যের কথা, এই এনজাইমের তারতম্য কিন্তু বংশগতির ধারার চেয়ে মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের কোষ থেকে বেরিয়ে আসা কিছু হরমোনের সঙ্গে বেশী সম্পর্কযুক্ত দেখা গেল বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় 'মস্তিষ্ক' থেকে ঐ সব হরমোন বেরিয়ে আসার পরিমাণে তারতম্য হয়, সেইজন্যে পরিবর্তিত হয় রক্তের ঐ বিশেষ এনজাইমটি! আশ্চর্যের কথা, যাঁরা হতাশাজনিত রোগে ভোগেন, তাঁদের রক্তে ঐ এনজাইমের পরিমাণও বেশী!

শুধু ফুসফুসের ক্যানসারই নয়, রক্তের একধরনের ক্যানসার এবং 'হজকিন্ ডিজিজ্' বলে আর আর একধরনের ক্যানসার নিয়ে গবেষণা চালালেন মার্কিনমুলুকে রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডাঃ উইলিয়াম গ্রীন। ডাঃ গ্রীনও দেখালেন—যাঁরা এই রোগে ভুগছেন তাঁদের অতীতেও

নানারকম হতাশা, দুঃখ বা নিঃসঙ্গতার ইতিহাস আছে। একইরকম তথ্য পেলেন লণ্ডনের কিং কলেজ হাসপাতালের ধাত্রীবিদ্যার গবেষক ডাঃ গির ও ডাঃ মরিস। তাঁরা দেখলেন—যে সব মেয়েরা বেশী হাসিখুশী, মনের ভাব চটপট প্রকাশ করে ফেলে, তাঁদের মধ্যে ক্যানসারের ঘটনা অনেক কম!

কিন্তু প্রশ্ন আসতেই পারে—মনমরা হয়ে থাকার সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক কি? ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ক্যানসার গবেষণা-কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডাঃ বার্নাড ফক্স নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে এলেন—মস্তিষ্কের মধ্যে 'হাইপোথ্যালামাস' বলে বিশেষ এক জায়গায় হয়তো গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। শরীরের যে বিভিন্ন রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তার প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হলো 'হাইপোথ্যালামাস'। আবার মানসিক নানা ব্যাপারস্যাপারের সঙ্গেও মস্তিষ্কের এই অংশটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ডাঃ ফক্সের মতে—দীর্ঘদিন ধরে মনমরা হয়ে থাকলে তার সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমজোরী হয়ে পড়ে, আর সেই ফাঁকে শরীরে ঢুকে পড়ে ক্যানসারের 'এজেন্টরা'! অবশ্য ফক্সের যুক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে নানা বিজ্ঞানীর নানা মত আছে।

—তবে কি জানো অন্তু, সরমাদি উঠে দাঁড়ালেন,—ক্যানসারের মতো মারাত্মক ব্যাধি, তার মোকাবিলার নিশ্চিত কোন অস্ত্র যখন আমাদের হাতে নেই, তখন যদি মনের স্ফূর্তিতে রোগ-প্রতিরোধের একটুও কাজ হয়, তাহলে হাসিখুসী থাকতে তো আর দোষ নেই।

ইচ্ছের জোরে কি না হয় !

সরমাদি ঘরে ঢুকতেই অন্তু লাফিয়ে উঠলো ।—আজ পড়াটড়া ধরার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে ।

হেসে ফেললেন সরমাদি । চেয়ারটায় বসে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন—তোমার তাড়া দেখেই বুঝতে পারছি, প্রশ্নটা খুবই জরুরী । আর দেরী না করে বলেই ফ্যালো…

—আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে রোগা-পটকা ছেলেটার নাম গোপাল । ওর নামও যেমন—আচার আচরণেও তেমনি একেবারে 'সুবোধ বালক' যাকে বলে । রেগে গিয়ে সেই ছেলেটাই আজ কি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরলো আপনাকে কি বলবো ! আমাদের চেয়ে দু'ক্লাস নিচে পড়ে একটা দারুণ পালোয়ান আর গুণ্ডা ধরনের ছেলে—সবাই ওকে রাবণ বলে ডাকে । রাবণ বোধহয় আজ গোপালকে কোনও খারাপ কথাটথা বলেছিল । স্কুলের ছুটির পর খেলার মাঠে দু'জনের মারপিট হলো । বললে বিশ্বাস করবেন না, ঐ হাড় জিরজিরে গোপাল—যাকে দেখলেই চারমূর্তির প্যালারামের কথা মনে পড়ে—সেই গোপাল কি মারটাই না মারলো রাবণকে । ওদের মারপিট দেখতে দেখতে আমার সেই মন্ত্রশক্তির গল্পটা মনে পড়ে গেল । সেই যে ঈশ্বর লাঠিয়াল একা একটা গোটা লাঠিয়ালের দলকে কাবু করেছিল । গল্পের শেষে ঈশ্বরের সেই বিখ্যাত কথা ঃ হুজুর আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানিনে । তবে লাঠি সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কি যেন ভর করে । লেখক বলেছিলেন—ঈশ্বরের ঐ শক্তিটা নাকি মন্ত্রশক্তি—যার শরীরে ভর করে সে নাকি সব কিছুতেই জিতে যায় । জানেন সরমাদি, আজ মারপিটের সময় আমাদের সেই রোগা পটকা গোপাল যখন রুদ্র মূর্তি ধরে পালোয়ানটাকে বেধড়ক পিটছিল—আমার মনে হলো ওর কাঁধেও বুঝি অলৌকিক শক্তি ভর করেছে । আচ্ছা, সত্যি সত্যি কি মন্ত্রশক্তি বলে কিছু আছে ?

—মন্ত্রশক্তি বলতে যদি ইচ্ছাশক্তিকে বোঝায় তবে বলবো—হ্যাঁ ; ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষ কি না করতে পারে ! মুমূর্ষু রোগী শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে দিনের পর দিন বেঁচে রয়েছে, ইচ্ছের জোরে মানুষ

দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পর্বতকে জয় করেছে—এমন ঘটনাতো বিরল নয়। আমাদের মধ্যে ইচ্ছেশক্তি কিভাবে জেগে ওঠে সেটা বুঝতে গেলে অবশ্য তোমাকে প্রেরণা বা 'মোটিভেশনে'র ব্যাপার-স্যাপারগুলো জানতে হবে।

—বেশ তো, বলুন না একটু শুনি। অন্তু সরমাদির কথা শোনার জন্য একবারে তৈরী।

—'প্রেরণা' বা ইচ্ছার ব্যাপার বোঝাতে গেলে—আমাদের শরীর মনের বিভিন্ন চাহিদার কথাগুলো বলতে হয়। আচ্ছা বলতো দেখি বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কোন কোন জিনিসের একান্ত প্রয়োজন?

—খাদ্য, বাসস্থান, জামাকাপড়···অন্তু যেন মুখস্থ বলে যায়।

—হ্যাঁ, সেইসঙ্গে—মানুষের সঙ্গ, ভালবাসা, নিরাপত্তা—বেঁচে থাকার জন্য এগুলোও মানুষের প্রয়োজন। এগুলোকে বলা যেতে পারে—সামাজিক বা মানসিক চাহিদা—এদের কথায় পরে আসছি। তুমি যে একটু আগে শারীরিক চাহিদাগুলোর কথা বললে—তার মধ্যে প্রথমেই আসে খাদ্য, পানীয়, ঘুম—এদের কথা। খাদ্য-পানীয় আমাদের শরীরকে শক্তি যোগায়। শরীরের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শরীর থেকে নোংরা আবর্জনাগুলি বেরিয়ে যাওয়াও দরকার। এগুলি হলো আমাদের প্রাথমিক চাহিদা। প্রাথমিক চাহিদার মধ্যে ঘুমকেও ধরতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকটা প্রাণীরই নিয়মিত ঘুমের প্রয়োজন। খিদে, তেষ্টা, ঘুম ঠিকমতো না হলে শরীরে যন্ত্রণার অনুভূতি হয়—আর সেই যন্ত্রণা কাটাতে মানুষ তখন খাদ্য-পানীয় খোঁজে, ঘুমের ওষুধ খায়। বুঝতেই পারছো—মানুষ যে সারাদিন কাজকর্ম খাটাখাটনি করে—সে আসলে ঐ প্রাথমিক চাহিদাগুলির পূরণের জন্যই।

—কিন্তু এর সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির সম্পর্কটা···। অন্তুর কাছে ব্যাপারটা কেমন অস্পষ্ট ঠেকে।

—বুঝতে পারলে না? খিদে, তেষ্টা, ঘুম—এসব প্রাথমিক চাহিদাগুলো যে প্রেরণার জন্ম দেয় তা যদি কোনও কারণে খুব বড় আকার ধারণ করে—তখনই তো ইচ্ছাশক্তির খেল্ শুরু হয়। বুঝিয়ে বলছি। ধরো, সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি—অনেকটা রাস্তা হেঁটে তুমি বাড়ী ফিরছো। পা যেন তোমার আর চলছে না। তারপর এক সময় দূর থেকে যেই তোমার বাড়ীটা নজরে এলো—অমনি দেখবে, তোমার হাঁটার গতি গেল বেড়ে। এর কারণটা কি বলতো দেখি?

—খিদে! অন্তু জবাব দেয়।—বাড়ীতে গেলেই খিদে মিটবে এটা মনে পড়ে গেলেই তো হাঁটার স্পীড বেড়ে যাবে।

—ঠিক তাই। সরমাদি সায় দেন।—এটাকেই একটু ঘুরিয়ে বলতে

পারি, খিদের অনুভূতি তোমার মনে এমন এক প্রেরণা যোগালো যার বলে তুমি চরম ক্লান্তির মধ্যেও ছুটতে পারলে ! অর্থাৎ খিদে মেটানোর তাগিদটা তোমাকে দিয়ে অসম্ভব একটা কাজকে সম্ভব করালো। খাদ্য, পানীয়, ঘুম বা মল-মূত্রত্যাগের মত সন্তানোৎপাদনের ব্যাপারটাও কিন্তু যে-কোনও প্রাণীর একটা প্রাথমিক চাহিদা। জড়বস্তুর সঙ্গে প্রাণীদের তফাৎটাই হল—প্রাণীদের জন্ম-মৃত্যু আছে, প্রাণীদের বৃদ্ধি হয়, প্রাণীরা সন্তানের জন্ম দেয়।

অন্তু বলে—আপনি যে মানসিক চাহিদার কথা বলবেন বলছিলেন।

—হ্যাঁ, সেদিকটাতেই এবার আসছি। তবে তার আগে বলে নিই, একটু আগে যে শারীরিক চাহিদাগুলির কথা বলছিলাম—সেগুলির ঠিকমতো পূরণ না হলে যেমন নানা রকমের শারীরিক বৈকল্য দেখা দেয় তেমনি মানসিক উপসর্গও কিছু কিছু তৈরী হয়। মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন—দীর্ঘদিন ধরে ঠিকমতো খাদ্য না পেলে মানুষের আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে ; দিনরাত তারা খাওয়ার কথা চিন্তা করে, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় বারে বারে খাবার-দাবারের প্রসঙ্গ টেনে আনে এবং সবচেয়ে বড় কথা—নিদারুণভাবে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তেমনি অনিদ্রায় ভোগে যারা—তারা যে নানা ধরনের হ্যালুসিনেশন বা ভ্রমের শিকার হয় তারও প্রমাণ রয়েছে বিস্তর।

ঠিক এই রকমই—আমাদের মনের যেসব চাহিদা আছে সেগুলি অপূর্ণ থাকলে মন খারাপ যেমন হয় তেমনি শরীরের ওপরও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মনের চাহিদা বলতে—অন্যের ভালবাসা, আত্মীয়তা, স্বীকৃতি—এগুলিকেই অবশ্য বোঝাচ্ছি। বেঁচে থাকার নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস—এসব হলো মানসিক চাহিদা, যা পূরণের জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত ইচ্ছে খাটাতে হয় ! মানসিক চাহিদাগুলির অতৃপ্তি থেকে দুঃখ, কষ্ট, ভয় আমাদের মনে বাসা বাঁধে এবং শরীরের ওপরও তার প্রভাব পড়ে তাতো বুঝতেই পারছো।

এতো গেল মানসিক চাহিদা। আমরা সমাজে বাস করি। সুতরাং আমাদের মধ্যে সামাজিক কিছু চাহিদাও যে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় চাহিদা বোধহয়—দল তৈরী করা অথবা কোনও দলের মেম্বার হওয়া। দলটা ছোট হতে পারে—যেমন পাড়ার ফুটবল টীম ; দলটা আবার লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক সংস্থা হতে পারে। সেই দলে ভাঙন দেখা দিলে কিংবা দলের সামনে কেনও সমস্যা এসে পড়লে—অর্থাৎ মানুষের 'দলভুক্ত' হওয়ার সামাজিক চাহিদা ক্ষুণ্ণ হলে, নানা ধরনের প্রভাব পড়ে সেই দলের প্রত্যেকটা লোকের উপর। অতৃপ্ত সেই সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য

কারোর মনে তাগিদ বা প্রেরণা জোরদার হয়ে উঠলে সে তখন নতুন দল গড়ে। এও তো সেই ইচ্ছেরই ব্যাপার।

—জানেন সরমাদি, বাবা বলেন—আমাদের দেশে অফিস কাছারীতে লোকজনের কাজ করার ইচ্ছে ক্রমেই নাকি কমে যাচ্ছে : কেউ কাজ করতে চায় না। কোনওভাবে এঁদের মধ্যে কাজের প্রেরণা বাড়ানো যায় না ?

—ভারী শক্ত প্রশ্ন করেছো ভাই। সরমাদিকে যেন একটু চিন্তিত দেখায়।—আগেই বলেছি, শারীরিক-মানসিক চাহিদাগুলো আমাদের মনে বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সেই প্রতিক্রিয়া থেকেই, বিশেষ কিছু কাজ করার ইচ্ছেটা তৈরী হয়। ঐ ইচ্ছেই মানুষকে সক্রিয় করে তোলে, ফলে কাজটাও ভালোয় ভালোয় শেষ হয়। কারোর মধ্যে যদি 'চাহিদা' কম থাকে, মোটা ভাত-কাপড়েই যদি সে তৃপ্ত থাকে—তবে কাজকর্মের ব্যাপারে তার মধ্যে অনীহা দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে কাজ করতে গিয়ে যদি হাজারটা বাধা আসে, কাজের পুরস্কারও যদি সময়মতো না মেলে তাহলে মানুষের মধ্যে কাজের প্রেরণার অভাব ঘটবে। সবক্ষেত্রে ভাল কাজের জন্য যদি ইনসেনটিভ্ বা পুরস্কার চালু করা যায়, ভাল কাজের যদি স্বীকৃতি দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে কাজের তাগিদটা অবশ্যই বাড়বে। আবার যে কোনও ধরনের প্রেরণা সৃষ্টির পেছনে শিক্ষারও একটা ভূমিকা আছে। কর্পোরেশনের যেসব কর্মী সকালবেলায় রাস্তা পরিষ্কার করে, তাদের যদি বোঝানো যায়—শহরের আবর্জনা পরিষ্কার না হলে নাগরিকদের মধ্যে কি ধরণের অস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হয়, কি কি ধরনের অসুখ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে—তবে জঞ্জাল সাফাই-এর ব্যাপারে তাদের মধ্যে বাড়তি প্রেরণা জাগা সম্ভব। অন্যদিকে প্রেরণা-সৃষ্টিতে সামাজিক শিক্ষারও ভূমিকা আছে। চীন-জাপানে শিশু-বয়স থেকেই মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বোঝানো হয়, যে যাই করুক আসলে তারা দেশের কাজ করছে। হয়তো সেজন্যই অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ওদের ইচ্ছেশক্তিতে ঘাটতি হয় না।

একনাগাড়ে কথাগুলি বলে সরমাদি থামেন। অন্তু জিজ্ঞাসা করে—আমাদের শরীর মনের এই যে এতরকম চাহিদা—এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশী জরুরী ? কার প্রভাব আমাদের ওপর সবচেয়ে বেশী ?

—তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই এ এইচ·মাস্‌লো—নামে এক মনোবিজ্ঞানী গুরুত্বের কমবেশী অনুযায়ী সমস্ত চাহিদার একটা চার্ট বানিয়ে দিয়েছেন। এই চার্টের গোড়াতেই আছে—খিদে, তেষ্টা, ঘুম—ইত্যাদি শারীরিক চাহিদাগুলি ; এগুলির পর নিরাপত্তা, ভালবাসা, আত্মসম্মান ইত্যাদি মানসিক চাহিদার স্থান একের পর এক। ঐ চার্টের ক্রমানুসারেই

চাহিদাগুলিকে তৃপ্ত করতে হয় আমাদের। অর্থাৎ খিদে-তেষ্টা না মিটলে মানুষ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে না, আবার নিরাপত্তার চাহিদা পূর্ণ হবার পরই ভালবাসার কথা ভাবে, একে অপরের সঙ্গে জোট বাঁধে।

অন্তু গালে হাত দিয়ে সরমাদির কথা শুনছিল। সরমাদি কথা থামিয়ে বললেন—পরীক্ষায় পাশ করার চাহিদাটা মেটানোর জন্য এবার তোমার বইপত্তরগুলো নামানো উচিত।

অন্তু হেসে উঠে অঙ্ক বইটার দিকে হাত বাড়ালো।

আকার আকৃতিও পাল্টেছে। যেমন, যখন বাচ্চাদের ছবি দেখানো হচ্ছিল—তখন প্রায় সব মহিলা দর্শকেরই চোখের মণিগুলি আকারে বড় হয়েছে অর্থাৎ আমরা যাকে বলি 'চোখ বড় বড় করে দেখা !' মনের কথাটা যে চোখের মধ্যে দিয়ে টের পাওয়া যায়—এটাই তো তার প্রমাণ।

অন্তু মাথা নেড়ে বললো—কিন্তু সরমাদি, বাচ্চাদের ছবি দেখার সময় মহিলাদের চোখ বড় বড় হলেই কি প্রমাণ হয়—তারা সবাই ঐ সময় বাচ্চাদের নিয়েই চিন্তা শুরু করে দিচ্ছেন ?

—না তা অবশ্য হয় না। তবে তোমাকে আরও একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলতে পারি—যাতে চিন্তাভাবনার সঙ্গে তারারন্ধ্রের আকৃতির সম্পর্ক অনেক স্পষ্ট ভাবে ধরতে পারা গেছে। যে এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছি, তাতে কিছু লোককে কয়েকটা বুদ্ধির অঙ্কের সমাধান করতে বলা হয়। দেখা গেল—অঙ্কটা যেই দেওয়া হচ্ছে, লোকেদের চোখের মণিও অমনি বড় হতে শুরু করছে—এবং যতই তারা অঙ্কটা নিয়ে চিন্তা করছে, অঙ্কের সমাধানের দিকে এগোচ্ছে—ততই তাদের চোখের মণি আরও বড় হচ্ছে।

অন্তু চুপচাপ শুনছিল, সরমাদি বললেন—তবে হ্যাঁ, চোখের মণি ছোট-বড় হওয়া ছাড়াও—আমাদের শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও চিন্তার ছাপ পড়ে। এখন থেকে বছর পঞ্চাশ আগে 'জ্যাকব্সন' নামে এক ভদ্রলোক একটা মজার পরীক্ষা করেছিলেন। একজন লোককে তিনি একটা হাতুড়ি দিয়ে দেওয়ালের গায়ে দু'টো পেরেক লাগাতে বললেন। পেরেক দু'টো লাগানোর সময় লোকটার হাতের পেশীর যতটা নড়াচড়া হলো—সেটা রেকর্ড করে রাখা হলো। পরে, লোকটিকে দেওয়ালের গায়ে পেরেক লাগানোর ব্যাপারটা চিন্তা করতে বলা হলো। দেখা গেল চিন্তার সময়ও লোকটার হাতের পেশীর একইভাবে নড়াচড়া হচ্ছে—যেন সত্যি সত্যিই সে তখন পেরেক লাগাচ্ছে !

চিন্তার সময় আমাদের মাংসপেশীর নড়াচড়া হবেই এমন কথাটা ঐ এক্সপেরিমেন্টের পরও অনেকেই অবশ্য মেনে নিতে পারেন নি। ১৯৪৭ সালে এ ব্যাপারটা নিয়ে আবার নতুন করে পরীক্ষা চালানো হলো। বছর চৌত্রিশ বয়সের এক স্বাস্থ্যবান ডাক্তারকে 'ডি-টিউবো-কুরেরিন' নামে ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে রাখা হয়। ওষুধটার কাজ হলো—সারা শরীরের প্রায় যাবতীয় মাংসপেশীকে তা কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল করে দেয়, যদিও মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে কোনরকম ব্যাঘাত ঘটে না। ঘণ্টা চারেক ধরে প্যারালিসিসের রোগীর মত শুয়ে থাকার পর বিশেষ প্রক্রিয়ায় যখন ডাক্তারটিকে আবার সুস্থ করে তোলা হলো—তিনি জানালেন—সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থাতেও তিনি স্বাভাবিক রকমের চিন্তা-ভাবনা করেছেন—এবং তা করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি।

আসলে, চিন্তা ভাবনার সময় যে আমাদের শরীরে পেশীর নড়াচড়ার কিছু ভূমিকা থাকে তাতে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই। তুমিই ভেবে দেখ না, কোনও বন্ধুর সঙ্গে হয়তো রাগারাগি হয়েছে—হয়তো তার সঙ্গে মারপিটও করেছো। ঐ মারপিটের কথাটাই চিন্তা করতে গিয়ে পরে হয়তো আন্‌মনেই বাতাসে ঘুসি মারছো। এরকম তো হামেশাই হয়। তবে শূন্যে ঘুসি না মারলে তুমি মারপিটের কথাটা চিন্তা করতেই পারবে না—এমন কথা কখনই বলা যায় না।

—আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে বড়মামার হঠাৎ বুকে ব্যথা শুরু হলো। ডাক্তারবাবু বললেন, অফিসের চিন্তাটিন্তা বন্ধ রেখে বাড়ীতে শুয়ে গল্পের বই পড়ুন। হার্টটাকে সামলে রাখতে হলে মনটাকে চিন্তামুক্ত করতে হবে।

অন্তুর কথায় সরমাদি সায় দিলেন, বললেন—চিন্তা করার সময় আমাদের হৃদস্পন্দন যে বেড়ে যায় তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। কোনও সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেই—আমাদের হৃদস্পন্দনের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে এবং সমস্যার সমাধানের মুহূর্তে ঐ সংখ্যাটা হয় সবচেয়ে বেশী। চোখ, শরীরের পেশী বা হৃদযন্ত্র—এগুলো ছাড়াও চিন্তার সময়ে অনেকই যে বিড় বিড় করে কথা বলে সেটাতো নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো। সাধু বাংলায় এটাকে বলা যেতে পারে—'উচ্চস্বরে চিন্তা!'

সরমাদি এবার ব্যাগ থেকে পেনটা বের করলেন, তারপর অন্তুর হোমটাস্কের খাতাগুলো টেনে নিতে গিয়ে বললেন—শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর 'চিন্তার ছাপ' পড়ে কি পড়ে না তার থেকেও বড় কথা হলো—মানুষে মানুষে চিন্তার এত প্রভেদ কেন? একজন মানসিক রোগী চিন্তা করে—এই বুঝি তার ঘরের ছাদটা ভেঙ্গে পড়লো! একজন সুস্থ লোক এমন চিন্তা কখনই করতে পারে না। আবার সমুদ্রের জল তো নীল দেখে সকলেই, তবু কেন বিজ্ঞানী রামনেরই মাথায় আসে আলোর এক বিশেষ ধর্মের কথা—যার জন্য আকাশ কিংবা সমুদ্রকে নীল দেখি আমরা? ক্লাসের পড়াগুলো হয়ে যাক্—তারপর বরং এই প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাবে, কি বলো?

সরমাদি খাতার পাতাগুলো উল্টোতে শুরু করলেন।

নতুন চিন্তার পেছনে

হঠাৎ করে কিছু হয় না, বুঝলে ?—'আবিষ্কারের গল্প'—বইটা অন্তুর হাতে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে সরমাদি বললেন।—আসলে কি জানো, যে কোনও আবিষ্কারের পেছনে একটা নির্দিষ্ট চিন্তাধারা থাকে, আবিষ্কর্তাদের অনলস পরিশ্রম থাকে...

—আর 'প্রতিভা' থাকে না বুঝি ? সরমাদির কথা শেষ হবার আগেই অন্তু বলে উঠলো।

—প্রতিভা, মানে যাকে বলে 'নব-নব-উন্মেষশালিনী-বুদ্ধি'—যে কোনও আবিষ্কারের পেছনে তার তো একটা ভূমিকা থাকেই ; যদিও এ ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের মতটা ছিল অন্যরকম। যখন ওঁকে প্রশ্ন করা হয় ঃ 'আচ্ছা, আপনি যে অগুন্তি যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন—এর পেছনে আপনার প্রতিভাময় চিন্তাধারার অবদান কতটুকু ?' এডিসন্ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন ঃ 'সামান্যই। আসলে প্রতিটি আবিষ্কারের জন্য আমাকে যে বিপুল পরিমাণে ঘাম ব্যয় করতে হয়েছে সেটাই হলো বড় কথা।' এডিসন্ নিশ্চয়ই বোঝাতে চেয়েছিলেন—কোনও, আবিষ্কারই হঠাৎ করে হয়ে যায় না ; এর পেছনে থাকে বিজ্ঞানীদের 'নাওয়া-খাওয়া- ভোলা' অনেকদিনের পরিশ্রম আর চিন্তা-ভাবনা।

সরমাদি থামতেই অন্তু বললো—আপেল পড়তে দেখে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার, কিংবা কেটলীর ঢাকনা নড়তে দেখে—জেমস্ ওয়াটের স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কার—এগুলি যে 'গল্প' তাতে না হয় সন্দেহ নেই ; কিন্তু একটু আগেই 'এক্স-রে' আবিষ্কারের ঘটনাটা পড়ছিলাম। 'এক্স-রশ্মি'র আবিষ্কর্তা—বিজ্ঞানী রোন্টগেন নাকি ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে একদিন তাঁর অন্ধকার ল্যাবরেটরীতে কাজ করছেন ; তাঁর ঘরের সমস্ত জানলা কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। ঘরের মধ্যে ক্যাথড-রশ্মি নিয়ে গবেষণা করছিলেন রোন্টগেন আর তাঁর সহকারী মোসাগু। হঠাৎ রোন্টগেনের খেয়াল হলো, তাঁর হাতের আঙটিটা তিনি খুলে রাখতে ভুলে গেছেন ; আসলে, ওঁর আঙটিটা যাতে পারদের সংস্পর্শে এসে নষ্ট না হয়ে যায় তার

জন্য প্রতিদিনই আগে থাকতে খুলে রাখতেন সেটা। যাই হোক, সেদিন হঠাৎ খেয়াল হতে, কালো মোড়কে ফটোর কাগজপত্রের উপর রাখা একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখলেন ওটা।

তারপর—সেদিনের কাজকর্মের শেষে রোন্টগেন যখন বাক্স থেকে তাঁর আঙটিটা বের করে আঙুলে পরছেন, হঠাৎ নজর পড়লো কালো কাগজে মোড়া ফটোর কাগজপত্রের ওপর। মনে পড়লো, আগের দিনের পরীক্ষার কতকগুলো ফটো 'ডেভলপ্' করা হয়নি। ঘরের আলো নিভিয়ে কালো কাগজের মোড়কটা খুলে ভেতরের ফটোগুলো 'ডেভলপ্' করতে গিয়ে দেখলেন—বাক্সের তলাতেই যে ফটোটা ছিল তার গায়ে ফুটে উঠেছে—আঙটির ছাপ। পরে অনুসন্ধান করে উনি জানতে পারলেন—বায়ু-শূন্য নলের মধ্যে যখন তিনি তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাচ্ছিলেন তখন তা থেকে একধরনের অদৃশ্য আলো বেরিয়ে এসে প্রথমে আঙটির ওপর পড়ে এবং পরে কালো কাগজকে ভেদ করে ফটোগ্রাফিক প্লেটকে 'এক্সপোজ্' করে দেয়। উনি এই নতুন রশ্মির নাম দেন—'এক্স রে'।

—তার মানে তুমি বলতে চাইছো, আঙটিটাকে সেদিন বাক্সের মধ্যে না রাখলে 'এক্স-রে'র আবিষ্কার হতো না? তা কিন্তু নয়। যদ্দুর জানি, 'এক্স-রে' আবিষ্কারের অন্ততঃ ২৫ বছর আগে থেকে রোন্টগেন সাহেব ঐ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে একটা বিশেষ বিষয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি এমন একটা ধাপে এসে পৌঁছেছিলেন যে ঐ আঙটি সংক্রান্ত ঘটনাটা না ঘটলেও এক্স-রে আবিষ্কার করতেনই। মাদাম কুরী'র রেডিয়াম আবিষ্কারকে ঘিরেও এ ধরনের 'গল্প' চালু আছে; অথচ, মাদাম কুরী ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী রেডিয়াম আবিষ্কারের আগে কত দিন, কত রাত ধরে গবেষণা চালিয়েছেন তার খোঁজ আর কে রেখেছে! আসলে, শুধু বিজ্ঞানীই নন, যে কোনও প্রতিভাবান মানুষ—তা তিনি সঙ্গীত-শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক বা চিত্রকর—যা হোন না কেন, তাঁর সৃজনশীলতার পেছনে এমন এক অসামান্য চিন্তাধারা থাকে যা তাঁকে ধাপে ধাপে পৌঁছে দেয়—আবিষ্কার বা সৃষ্টির দোরগোড়ায়।

সরমাদি থামতেই অন্তু বললো—প্রতিভাবান মানুষদের বুদ্ধিটা যে অনেক ধারালো—সেটা তো ঠিক?

—'প্রতিভা'র সঙ্গে 'বুদ্ধি'র একটা সম্পর্ক আছে সন্দেহ নেই, তবে সে সম্পর্কটা খুব পরিষ্কার নয়। প্রতিভাবান মানুষদের বুদ্ধি নিশ্চয়ই সাধারণের চেয়ে বেশীই থাকে তবে 'বুদ্ধি'টা তুখোড় হলেই তিনি যে প্রতিভাবান হবেন এমনটা বলা যায় না। আসলে 'বুদ্ধি' ছাড়াও প্রতিভাবান মানুষদের আরো কিছু বিশেষত্ব থাকে—যেমন এঁরা চিন্তা এবং কাজকর্মে স্বাধীন থাকতে চান; কৌতুকবোধ, ইংরাজীতে থাকে বলে 'সেন্স অফ্ হিউমার'—এঁদের

চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব ; নতুন, অভিনব যে কোনও জিনিষের প্রতি এঁদের দুর্নিবার আকর্ষণ থাকে ; যে কাজে যত বেশী জটিলতা, সে কাজ এঁদের তত বেশী পছন্দ ! স্কুলের ছেলেমেয়েদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে—বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে চায়, ভবিষ্যৎ জীবনে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হতে চায়, কারণ তা হতে পারলে অর্থ এবং সম্মান জোটে। প্রতিভাধর ছেলেমেয়েদের জীবনের লক্ষ্যগুলো হয় অন্যরকম। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করাটাকেই এরা এদের স্কুলজীবনের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করে না ; এদের অধিকাংশই বড় হয়ে গবেষক-বিজ্ঞানী, লেখক কিংবা 'রোমাঞ্চকর অভিযাত্রী'র জীবন বেছে নেয়।

—আপনি যে তখন বললেন, প্রতিভাবান মানুষদের চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব থাকে যার জন্যই তাঁরা কোনও কিছু 'সৃষ্টি' করতে পারেন—তা, তাঁদের চিন্তার সেই 'বিশেষত্ব'টা কি ?—অন্তু জিজ্ঞাসা করে।

—ঠিক এই প্রশ্নটার উত্তর গত ৫০/৬০ বছর ধরে মনোবিজ্ঞানীরা খুঁজছেন। সরমাদি শুরু করেন।—কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ? একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, শিল্পী বা লেখকের 'সৃষ্টি' থেকে উপকৃত হয়, উদ্বুদ্ধ হয় হাজার-লক্ষ মানুষ। প্রতিভাশালী মানুষদের চিন্তার ধরন-ধারনগুলোকে জেনে নিয়ে—সেই চিন্তার বীজ সাধারণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুনে দিতে পারলে, সমাজে প্রতিভাবান মানুষদের সংখ্যাটা যে বাড়বে সেটা আশা করা যায়।

প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে—ওঁদের চিন্তাধারাকে সাধারণত চারটে পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমটাকে বলা যায় প্রস্তুতির পর্যায়। এ সময়টায় প্রতিভাবান মানুষটি পড়াশুনো এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন, পরবর্তীকালের অবদানের জন্য প্রাথমিক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেন ; এর পর আসে চিন্তায় 'তা দেবার সময়'। এই পর্যায়ে—বিশেষ কতকগুলি চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে বিজ্ঞানী বা শিল্পীর মাথায়। দেখা গেছে—অনেক শিল্পী একটা বিশেষ ছবির কথা ঘুরে ফিরে ভাবছেন এবং তার মধ্যে হয়তো মাস কেটে যায়, বছর কেটে যায়—হয়তো অন্য ছবিও আঁকছেন এর মধ্যে—তবে ঐ বিশেষ ছবিটার কথা ঘুরে ফিরে তাঁর মনের মধ্যে আসছে ! একই ব্যাপার লেখক বা বিজ্ঞানীদের মধ্যেও দেখা যায়। তারপর একসময় আসে প্রতিভাময় চিন্তা-ভাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়—যে সমস্যাটা নিয়ে বিজ্ঞানী মাথা ঘামাচ্ছেন—তার সমাধানটা বিদ্যুতের মতো হঠাৎ করে মাথার মধ্যে খেলে যায় এই সময়টায় ; চিন্তা-ভাবনার শেষ পর্যায়ে সেই

সমাধানকেই কাজে রূপ দেবার চেষ্টা চলে।

সরমাদি কথা শেষ করে অঙ্কের বই-এর দিকে হাত বাড়াতেই অন্তু বললো—আপনি এই যে বললেন, প্রতিভাময় চিন্তার তৃতীয় পর্যায়ে সমাধানটা বিদ্যুতের মত হঠাৎ মাথার মধ্যে চলে আসে—সেটা কিভাবে হয় ?

সরমাদি মুচকী হেসে বললেন—আরে সেটা জানতে পারলেই তো কেল্লা ফতে !



পরিবেশের হেরফেরে কি আচরণ বদলায় ?

আজ স্কুল থেকে বাড়ী দেয়ার সময় বাসের মধ্যে এক কাণ্ড হলো।—সরমাদি এসে বসতেই অন্তু বলে উঠলো।

—কি ব্যাপার শুনি। সরমাদি রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করেন।

—কেন জানি না, আজকের স্টেট-বাসটায় বেশ ভিড় ছিল। অন্তু শুরু করে।—বাসটা পদ্মপুকুরের কাছে আসতেই সীটে বসে থাকা এক ভদ্রলোক নামবেন বলে উঠে দাড়ালেন আর অমনি সেই ফাঁকা সিটটায় বসার জন্য সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন লোকের মধ্যে হুটোপাটি লেগে গেল। এক ভদ্রলোক বেশ শক্তসমর্থ, তিনি আগে সীটটা দখল করতেই তাঁর কোলের ওপরই বসে পড়লেন দ্বিতীয় জন—তাঁর বয়স কিন্তু পঞ্চাশের কম নয়। তারপর সীটে কে বসবে তাই নিয়ে কি ঝগড়া! বাসও চলছে, দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রথম জনের কোলে চেপেই চলেছেন—বাসের অনেকে হাসাহাসি করছে—তা, ওঁদের যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। আশ্চর্যের কথা কি জানেন, চার-পাঁচটা স্টপেজের পর দেশপ্রিয় পার্ক আসতেই বয়স্ক ভদ্রলোক বাস থেকে নেমে গেলেন। একবার ভাবুন—মিনিট পাঁচেক বসার জন্য কি কাণ্ডটাই না করলেন উনি!

—আসলে কি জানো, শহরে যত ভিড় বাড়ছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ততই কমছে ; আমাদের এই কলকাতা শহরেই ধরো—সারাদিন ধরে বাসট্রামে ভিড় লেগে রয়েছে। রেশনের জন্য, কেরোসিনের জন্য, ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—আজ থেকে দশ বছর আগেও কি কেউ ভেবেছে ? এর ফলে মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, একে অন্যের সাহায্যে আর তেমন করে এগিয়ে আসছে না। তা এখনই তো এই অবস্থা, এরপর যখন শহরে ভীড় আরও বাড়বে—একটা মাত্র ঘরেই যখন পার্টিশন ছাড়াই একাধিক পরিবারকে মাথা গুঁজতে হবে, কিংবা কলকারখানায় বিভিন্ন শিফ্‌টে কাজ করার মতো একই বিছানায় একাধিক লোককে 'শিফ্‌টে ঘুমনো' অভ্যেস করতে হবে—মানুষের আচার-আচরণ আরও কত জটিল হবে কে জানে!

—শুনেছি, নরওয়ে-ডেনমার্কে লেমিং—নামে একধরনের ইঁদুর আছে—যাদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে, নিজেরাই গিয়ে তারা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরে। অন্তু বলে ওঠে।

ঠিকই শুনেছো। অন্তুর কথায় সরমাদি সায় দেন।—তবে শুধু লেমিং-ই নয়, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জন্তুজানোয়াররা সংখ্যায় খুব বেড়ে গেলে তাদের অনেকেরই মধ্যে মড়ক লেগে যায়। নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে সত্যিই কোন প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা আছে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে একবার আমেরিকার মেরিল্যান্ড উপকূলের কাছে ছোট্ট এক নির্জন দ্বীপের হরিণদের ওপর নজরদারি চালানো হয়। কোন্ এক সময়ে অল্প কয়েকটি হরিণকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ঐ দ্বীপে ; দ্বীপটিতে কোনও হিংস্র জন্তু না থাকায় বছর কয়েকের মধ্যে হরিণের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় তিনশো। তারপর, খাদ্যের ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করেই ওরা পটাপট্ মরে যেতে লাগলো। বিজ্ঞানীদের যে দলটি ঐ দ্বীপে হরিণের বংশবৃদ্ধির ওপর নজর রাখছিলেন তাঁরা মৃত হরিণগুলির হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, কিডনী ইত্যাদি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে রায় দিলেন—অপুষ্টি বা অসুখবিসুখ ওদের মৃত্যুর কারণ নয়, বরং সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ার দরুণ জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাফেরার জায়গা কমে যাওয়ার ফলে ওদেব শরীর-মনে এমন কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছে যা ওদের গণমৃত্যুর কারণ। বস্তুতঃ ঐ দ্বীপে হরিণের সংখ্যা কমতে কমতে যখন ৮০-তে এসে ঠেকলো, ওদের মৃত্যুহারও আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে জন্তুজানোয়ারের ওপর ভিড়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন যাঁরা তাঁদের অন্যতম—জন ক্যালহন। প্রায় ২০ বছর ধরে ইঁদুরদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে উনি দেখেছেন—বদ্ধ খাঁচায় ইঁদুরদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে অদ্ভুত সব আচার-আচরণ করতে থাকে ওরা। পুরুষ ইঁদুরদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা অনেকটা জায়গা দখল করে ; অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইঁদুররা অল্প জায়গায় গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হয়, এবং এদের অনেকেই কেমন যেন মনমরা হয়ে খাঁচার কোণে চুপচাপ পড়ে থাকে। শারীরিক পরীক্ষায় এদের কিডনি, লিভার এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে নানা ধরনের বিকৃতি নজরে এসেছে। এক জায়গায় অনেকে জড়ো হওয়ার ফলে এরা যে স্নায়ুর চাপে ভোগে—ঐসব অস্বাভাবিকত্বই তার প্রমাণ।

অন্তু উস্‌খুস করে।—মানুষের ক্ষেত্রে এমনটা হয় নাকি ?

—ভিড় মানুষের মনে কি জাতীয় প্রতিক্রিয়া জাগায় সে সম্পর্কে এযাবৎ যা জানা গেছে সেটাই বরং তোমায় বলি। সরমাদি শুরু করেন।—গরমের

দিনে একটা বড় ঘরে অনেকে মিলে কাজ করার সময় তাদের যতটা গরম লাগে, অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে কাজ করতে হলে গরমটা লাগে তার চেয়ে অনেক বেশী। শীতের দিনেও একই কথা ; অর্থাৎ, ঘরের মধ্যে হাত-পা ছড়ানোর পরিসর কমে এলে মানুষের শীতটা করে বেশী। আবার অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত মানুষদের সঙ্গে একটা বড় ঘরের তুলনায় ছোট্ট ঘরে সময় কাটাতে বাধ্য হলে আমাদের অস্বস্তি বাড়ে।

ভিড় মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধকে ধাক্কা দেয়, ফলে তার মনের ওপর চাপ পড়ে। এই মানসিক চাপই সময়ে সময়ে নৈরাশ্য, নানা বিষয়ে বে-বনিবনা আর ক্লান্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। বাসের মধ্যে সামান্য একটু সময় সীটে বসার জন্য যে ঝগড়াঝাঁটি-মারামারি লেগে যায় তার কারণটা এবার বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই।

অন্তু মাথা নেড়ে বললো—হ্যাঁ।

• • •

আপনি মানুষের মনে ভীড়ের প্রভাবের কথা বলছিলেন ; আচ্ছা, আমাদের মন ভাল থাকা—খারাপ থাকার ব্যাপারে প্রকৃতিরও তো হাত থাকে—তাই না ?—বইখাতা গুছিয়ে তুলতে গিয়ে অন্তু জিজ্ঞাসা করে।

—তার মানে ? সরমাদি হাত ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকান।

—এই যে পূর্ণিমার রাতে মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, অনেকের নাকি কবিতা লেখার চাড় আসে···বলতে বলতে অন্তু হেসে ওঠে।

সরমাদিও হেসে ফেলেন। বলেন—মন খুশ-করা চাঁদনী রাতে কবিদের কবিত্বটা বেশী করে জাগে কিনা তা যাচাই করতে কেউ গবেষণা চালিয়েছেন বলে জানি না, তবে পূর্ণিমা-অমাবস্যায় যে অনেকেরই মানসিক ভারসাম্যের এদিক ওদিক হয়—সে ব্যাপারে প্রমাণ আছে বিস্তর। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭০—এই পনেরো বছরে আমেরিকার ফ্লোরিডার এক কাউন্টিতে যত খুন-জখমের ঘটনা ঘটে—এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, তার অধিকাংশই ঘটেছে পূর্ণিমার রাতে। এই সমীক্ষার পর যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তাতে মনোবিজ্ঞানীদের বক্তব্য ছিল—যেহেতু মানুষের শরীরের যাবতীয় পদার্থের শতকরা ৮০ ভাগই হলো জল, সেজন্য অমাবস্যা-পূর্ণিমায় চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে আমাদের শরীরের মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন হয় যার ফলস্বরূপ মানুষের মেজাজ-মর্জিও যায় পাল্টে। এছাড়া পূর্ণিমার রাতে খুনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার অন্য কোনও ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিতে পারেননি।

খুন-জখমের কথা বাদ দিলেও, বেশ কিছু মানসিক রোগের ক্ষেত্রে চাঁদের যে একটা বড়সড় ভূমিকা আছে—এমন একটা ধারণাকেও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। মানসিক রোগগ্রস্তদের 'লুনাটিক' বলার রেওয়াজ আজও রয়েছে ; শব্দটার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'চন্দ্রাহত'। ব্যাপারটা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে শিকাগোর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাল্‌ফ্ মরিস দেখেছেন—পূর্ণিমার পূর্ণ-চাঁদ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দনের গতি বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। মরিস আরো দেখেছেন—পূর্ণিমার রাতে শরীরের বিপাকক্রিয়ার হার যেমন বাড়ে, তেমনি রক্তক্ষরণ এবং এপিলেপটিক ফিট-এর ঘটনাও বেশী করে ঘটতে দেখা যায়।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে সরমাদি একটু দম নেন। তারপর বলেন—মনোবিজ্ঞানীদের মতে—চাঁদনী-রাতে মানুষ বেশী কল্পনা-প্রবণ হয়ে পড়ে। যেসব মানুষের এমনিতেই মানসিক রোগের দিকে প্রবণতা আছে, তারা পূর্ণিমার রাতে হঠাৎ উদ্ভট সব চিন্তাভাবনা শুরু করে। কেন এমন হয় তার উত্তর অবশ্য এখনও অজানা।

যাই হোক, চাঁদের সঙ্গে মানুষের মনের সম্বন্ধ খুঁজে বের করতে শারীর-বিজ্ঞানীরা যে সব গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে নতুন নতুন তথ্য কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। ওঁরা দেখেছেন—আমাদের মেটাবলিসম্ বা বিপাকক্রিয়া সাধারণতঃ চান্দ্রমাসিক চক্রে আবর্তিত হয় ; অর্থাৎ পূর্ণিমার সময় যে বিপাকক্রিয়া সবচেয়ে বেশী জোরদার—অমাবস্যার সময়ে তা কমতে কমতে দুর্বলতম অবস্থায় এসে ঠেকে। তারপর, আকাশে চাঁদের আকার যতই বাড়তে থাকে ততই বিপাকক্রিয়ার হারও বাড়তে থাকে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ব্যাপারটা জানা ছিল বলেই হয়তো অমাবস্যায় উপবাস বা স্বল্পাহারের রীতি চালু হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস—প্রাণীদের বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের হয়তো একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। এ ব্যাপারে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস এবং পিটুইটারি ও পিনিয়াল গ্রন্থির মাঝখানের অংশটুকুর কিছু ভূমিকা থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়ালো—পৃথিবীর ভু-চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হলে তার প্রভাব পড়বে আমাদের শরীর মনে। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের এই পরিবর্তন যেমন চাঁদের কলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তেমনি সৌরকলঙ্কের সংখ্যার তারতম্য পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের হেরফের ঘটায় বলেও জানা গেছে। হাল আমলের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে—যে বছর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা হয় সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ যে বছর সূর্য অন্য বছরের তুলনায় বেশী মাত্রায় সক্রিয় থাকে, সূর্যের গা থেকে লকলকে সৌরশিখা

বেশী করে বেরোতে থাকে—সে বছর নাকি মানুষের হৃদস্পন্দনের হার বাড়ে। ফলে, আমাদের হৃদপিণ্ড কমজোরী হয়ে পড়ে। মোট কথা, চাঁদ বা সূর্যের প্রভাবে পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হলে তার ছাপ পড়ে কিছু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু জায়গায় ; এতে আমাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের হেরফের ঘটে এবং সম্ভবতঃ স্মৃতিশক্তিও ঠিকমতো কাজ করে না। আর সাময়িকভাবে স্মৃতি লোপ পেলে—মনের মধ্যে যে অবাস্তব কল্পনা এবং উদ্ভট সব চিন্তাভাবনা আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি !



উদ্ভট সব চিন্তা-ভাবনা

অন্তু, কখনও কোনও মানসিক রোগীকে দেখেছো ?

বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে আটটা বাজলো। অন্তুর পড়া হয়ে গিয়েছিল। বই খাতা গুছোতে গুছোতে সরমাদির প্রশ্নের জবাব দিল : মানসিক রোগী মানে পাগল তো ? আমাদের গলির মুখটায় যে পানের দোকানটা আছে—তার পাশের রকটাতেই তো হীরু পাগলা বসে থাকে, আপনমনে কি সব বিড় বিড় করে বলে—আপনি দেখেননি ?

—মানসিক রোগীদের 'পাগলা' বলে ডাকাটা কিন্তু ঠিক না অন্তু। খুব আস্তে আস্তে বলে ওঠেন সরমাদি।—ধরো তোমার জানাশোনা কারোর টিউবারকুলোসিস্ মানে যক্ষা হয়েছে। পরে কোনও সময়ে তার সঙ্গে দেখা হলে তুমি কি বলবে, 'এই যে টি-বি রুগী, কেমন আছো ?'

—ধ্যাৎ, তাই কখনও কেউ বলে ! অন্তু লাজুক স্বরে বললো।

—যক্ষার ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলতে পারি না, মানসিক রোগের ক্ষেত্রেই বা সেটা বলবো কেন ? তোমাদের হীরু নামে যার কথা তুমি এক্ষুণি বললে, তার একটা বিশেষ অসুখ করেছে বলেই না সে অমন বিড়বিড় করে ! আসলে কি জানো, কোনও মানুষের যখন বড় রকমের অসুখ হয়—আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের তুলনায় সে নিজেকে খানিকটা হীন বলে মনে করতে থাকে। সেই অসুস্থ রোগীটিকে যদি তার অসুখের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা অসুখটার জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়, তবে তার হীনমন্যতাটা বাড়ে, নিজেকে সে আরও গুটিয়ে নেয় সুস্থ মানুষদের কাছ থেকে। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এর ফলটা হয় মারাত্মক ; সুস্থ লোকেদের কাছ থেকে যতই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ততই তার রোগ-লক্ষণ বাড়তে থাকে। অসুখ থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনাটাও ততই তার কমতে থাকে।

অন্তু মাথা নিচু করে শুনছিল। সরমাদি বললেন—যে যাকগে, যেটা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। মানসিক রোগীদের সংস্পর্শে যদি কখনো আসো, দেখবে—ওদের চিন্তা-ভাবনাগুলো কেমন জট পাকানো, উদ্ভট ধরনের। যেমন একজনকে দেখেছি—দিনরাত তার এক চিন্তা : সূর্য যদি

হঠাৎ নিভে যায় তবে আমাদের কি হবে ? গাছ-গাছড়া সূর্যের আঁলো ছাড়া বাঁচবে কি করে ? সূর্য না থাকলে আমরা দিন-রাত্তিরকে আলাদা করবো কি করে ?

অন্তু সরমাদির কথায় ফিক্ করে হেসে ফেলেই বললো—লক্ষ কোটি বছরের মধ্যেও তো এমন ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। আর লক্ষ লক্ষ বছর পরে যদি এমনটা ঘটেও তা নিয়ে এখন কারোর মাথায় কি সত্যিই এমন উদ্ভট চিন্তা আসতে পারে ?

—নিশ্চয়ই পারে। শুধু তাই নয়, মানসিক রোগটা বাড়লে—'চিন্তা'র বদলে তার মনের মধ্যে ভ্রান্তবিশ্বাস বাসা বাঁধতে পারে, সূর্য যেন সত্যি সত্যিই নিভে গেছে—এমনটা ধরে নেওয়া তার কাছে তখন মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

—তাহলে প্রথমে আসে 'চিন্তা', তারপর সেই চিন্তা থেকে 'বিশ্বাস' ? অন্তু জিজ্ঞাসা করে।

—ঠিক তাই। সরমাদি উত্তর দেন।—একজন রোগীর কথা বলি তোমাকে। সে ভাবতো, একদিন না একদিন সে ভগবানের দেখা পাবেই। ক্রমাগত এই চিন্তার ফলে এক সময় তার মনে বিশ্বাস জন্মালো—যেন সত্যিই সে ভগবানের দেখা পেয়ে গেছে। লোকজনকে ডেকে সে বলতো ঃ আমি ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি ; এই তো তিনি আমার কাছে এসেছেন ; তোমরা পাপী, তাই তাঁর দেখা পাচ্ছ না—এইসব প্রলাপ সে ক্রমাগতঃ বকে যেতো। আবার, কলকাতার এক মানসিক রোগের হাসপাতালে একজন রোগীকে দেখেছিলাম—তার বিশ্বাস সে নাকি বহুদিন আগেই মারা গেছে। খোঁজ নিলে দেখা যেতো, অনেক আগে সে হয়তো প্রায়ই নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতো, তার মনের অসুখ বাড়ার সাথে তার সেই চিন্তাই তখন ভ্রান্তধারণার রূপ নেয়।

এই যে ভ্রান্তধারণার কথা বলছি, চলতি ইংরাজীতে এদের বলে ডেলিউশন্। এগুলো আবার নানা ধরনের হয়ে থাকে। যেমন কোনও কোনও মানসিক রোগীর এক বিশেষ ধরণের ভ্রান্তধারণা হয়—যেন আশপাশের সবাই তাকে নিয়েই আলোচনা করছে, সাহিত্যিকরা তাকে নিয়েই গল্প লিখছে। আবার মানসিক অসুস্থতার সময় কেউ কেউ বিশ্বাস করে, তার শত্রুরা যেন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে তার মনের কথা টের পেয়ে যাচ্ছে ; তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে জোর করে কিছু করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর এক ধরনের ভ্রান্তবিশ্বাসকে ইংরাজীতে বলে ডেলিউশন অফ পারসিকিউশন্। এক্ষেত্রে মানসিক রোগীর ধারণা হয়—সবাই যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে।

সরমাদি থামতেই অন্তু বললো—জানেন, আমার এক বন্ধুর জামাইবাবু মাঝে অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন ; সবাইকে উনি বলতেন—অফিসে নাকি সবাই ওঁকে নিয়ে ফিসফিস্ করে আলোচনা করে ; সুযোগ পেলে কেউ কেউ নাকি মারধোরও করতে পারে ওঁকে। আমার বন্ধুটির বাড়ী থেকে যখন অফিসে খোঁজ নেওয়া হলো, দেখা গেল—সব বাজে কথা, অফিসে কারোর সঙ্গেই ওর কোন শত্রুতা নেই। এখন অবশ্য ওষুধ-টষুধ খেয়ে উনি অফিস যাতায়াত করছেন।

সরমাদি বললেন—আসলে ভদ্রলোকের একটা বিশেষ ধরনের মানসিক রোগ দেখা দিয়েছিল যার লক্ষণ হলো ওইধরণের সব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা। আমি আবার এমন রোগীকেও জানি—যার বিশ্বাস সে যেন একজন বিরাট কোনও মানুষ। এও এক ধরনের ডেলিউশন।

—কি রকম ? অন্তু জিজ্ঞাসা করে।

—একবার মানসিক রোগের হাসপাতালে বছর পঁচিশ বয়সের এক রোগীকে দেখেছিলাম যার বদ্ধ ধারণা ছিল ঃ ওই হাসপাতালটা নাকি আসলে বাকিংহাম প্যালেস এবং সে নিজে ঐ প্রাসাদের মালিক ! শুধু তাই না, পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে নাকি ডক্টরেট উপাধি দিয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম—বি·এস·সি পরীক্ষাও সে পাশ করতে পারেনি এবং অত্যন্ত দুঃস্থ পরিবারের ছেলে সে। তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাইবে, এমন উদ্ভট ধারণা তার হলো কেন ? এই 'কেন'র উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, ছেলেটি নাকি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিল। ও ভাবতো—ভাল করে পড়াশোনা করে একদিন ও অনেক বড় হবে, সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করবে। কিন্তু বি-এস-সি পরীক্ষায় ফেল করে যাওয়ায় তার সেই অভিলাষ আর পূর্ণ হলো না। পরীক্ষায় ফেল করার জন্য প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পায় সে, সেই কারণেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সবাই বুঝি ওর অকৃতকার্যতার জন্য ওকে ব্যঙ্গ করছে, ও সবার কাছে ছোট হয়ে গেছে—এ রকম একটা হীনমন্যতা ওর মধ্যে তখন জেগে ওঠাটা স্বাভাবিক। এই হীনমন্যতা থেকে বাঁচার জন্য তার মনে মনে সে কল্পনা করে নেয়—সে যেন বিরাট পণ্ডিত, বিশাল বড়লোক হয়ে গেছে, বাকিংহাম প্যালেসে সে বাস করছে। অসুখটা যখন বাড়ে, তার সেই উদ্ভট চিন্তাই দৃঢ় বিশ্বাসের রূপ নেয়। ইংরাজীতে একেই বলে 'ডেলিউশন অফ গ্র্যানজার'।

সরমাদি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, অন্তু বললো—মানসিক রোগীদের মধ্যে এই যে হীনমন্যতার ভাব থাকে যার জন্য তারা সব উদ্ভট

চিন্তা করে, ডেলিউশনে ভোগে—তার পেছনেও তো নিশ্চয়ই কিছু কারণ থাকে, তাই না ?

সরমাদি দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন—তা তো থাকেই। দেখা গেছে ছোটবেলায় যারা খুব আদরে মানুষ হয়, অথবা যারা ছোটবেলায় ভালবাসা থেকে বঞ্চিত থাকে পরবর্তী জীবনে তাদের অনেকেই আর পাঁচজনের সাথে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না—হীনমন্যতার তো সেটাই প্রথম লক্ষণ।

আত্মহত্যার রহস্য

ঘরে ঢুকেই সরমাদি অবাক ; অন্তুর ঘর ভোঁ ভাঁ ফাকা। এমনটা সাধারণতঃ হয় না। সরমাদি আসবেন জানলে অন্তু আগে থেকেই টেবিল-চেয়ার দখল করে বসে থাকে।

অন্তুর মা ঘরে ঢুকে পাখার সুইচটা অন্ করে দিয়ে বললেন—কি যে হয়েছে ছেলেটার ! স্কুল থেকে এসে অবধি গোমরা মুখ করে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, স্কুলে কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে কি না। তা, কে কার উত্তর দেয় ! ঐ দেখ, বারান্দায় গিয়ে অন্ধকারে বসে আছে।

—আমি দেখছি মাসীমা। আপনি বরং ওকে ঘরে আসতে বলুন। সরমাদি চেয়ার টেনে বসে পড়েন।

অন্তু গুটি গুটি ঘরে ঢোকে। সরমাদি বলেন—স্কুলে নিশ্চয়ই আজ খুব মন খারাপ হওয়ার মতন ঘটনা ঘটেছে, তাই না ? এখানে বসো। আমায় বলতো—কি হয়েছে ?

—আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে, কি বলবো আপনাকে—কালও ওর সঙ্গে বিকেলে বাসরাস্তা অবধি একসঙ্গে এলাম—অন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যায়।

—কি হয়েছে ছেলেটির ?

—কাল রাত্রে ও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে—বলেই অন্তু মাথা নিচু করে।—কোত্থেকে যে ঐ বিষ ও যোগাড় করেছিল কে জানে, তবে হাসপাতালে ও মারা যাওয়ার আগে বলেছে—ওর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আজ হেডস্যার আমাদের ক্লাসের কয়েকজনকে নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলেন। বাড়ীতে অবশ্য বলিনি—

অন্তু কি যেন ভাবে ; তারপর ফস্ করেই জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা সরমাদি, যারা আত্মহত্যা করে তারা কি সব মানসিক রোগী ? নইলে ভাবা যায়—কেউ নিজেই নিজেকে মেরে ফেলছে !

—আত্মহত্যা কারা করে, কেন করে, কিভাবে করে—সে ব্যাপারটা তোমায় যতটা পারি বুঝিয়ে বলছি, তবে তার আগে আত্মহত্যা-সংক্রান্ত একটা খবরের কথা তোমাকে বলি। যদ্দূর মনে পড়ছে, খবরটা ছিল

এইরকম—'বাঙালীদের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা বাড়ছে। যে সব রাজ্যে বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা যে সব রাজ্যে অনেক বাঙালী বসবাস করেন, সেই সব রাজ্যেই আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪—এই আট বছরে দেশে যেসব আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে পুলিশের তরফ থেকে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ দেশে মোটামুটিভাবে বছরে গড়ে প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে আট জন মারা যায় হয় বিষ খেয়ে নয়তো গলায় দড়ি দিয়ে কিংবা রেললাইনে মাথা পেতে অথবা অন্যান্য উপায়ে। একটা সময় ছিল যখন গুজরাটের মানুষদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল সর্বাধিক। কিন্তু ১৯৭৪ সালে দেখা দেখা যাচ্ছে সেই ভূতটা বাঙালীদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। এখন পণ্ডিচেরী আর আন্দামান-নিকোবর বাদ দিলে সবচেয়ে বেশি লোক আত্মহত্যা করছে ত্রিপুরায়—প্রতি এক লক্ষে ২৬ জন। পরের স্থানই পশ্চিমবঙ্গের, লাখে ১৯ জন।' তবে হ্যাঁ, আত্মহত্যা আমাদের দেশে এখনো তেমন কোন বিরাট সমস্যা নয় যতটা ব্যাপক আমেরিকার মত দেশে যেখানে আত্মহত্যার অনুপাত আমাদের দেশের তুলনায় তিন গুণেরও বেশি।

—কিন্তু, লোকে আত্মহত্যা করে কেন ? অন্তু আবার জিজ্ঞাসা করে।

—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মানুষ আত্মহত্যা করে মানসিক টানাপোড়েন আর যন্ত্রণার জন্যে। সরমাদি বলে চলেন—অন্ততঃ একজন মনোবিজ্ঞানীকে জানি যাঁর মতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ জীবনের কোন না কোন সময় আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে ; যদিও আবার সে চিন্তাটা অধিকাংশ মানুষই কাটিয়ে উঠতে পারে। দেখা গেছে, যে কোন মানুষই সাধারণতঃ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, একা থাকা অবস্থায় তার ওপর মানসিক চাপ যখন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে উঠে তখন এবং বলা বাহুল্য, তার সমস্যা সমাধানের তাৎক্ষণিক কোন রাস্তা যখন সে দেখতে পায় না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মহত্যা ঘটে দুর্ঘটনার মতই অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। উদাহরণ দিচ্ছি—ধরো, কেউ তার নিজস্ব কোন সমস্যায় আশপাশের পাঁচজনের সহানুভূতি চাইছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে এবং তার কথায় যে কেউ বিশেষ কান দিচ্ছে না তাও সে অনুভব করছে। এর ফলে লোকটির মধ্যে অন্যের প্রতি রাগ ও অ্যাগ্রেশন্ তৈরি হতে পারে। সময়ে সময়ে তা প্রকাশের রাস্তা না পেয়ে ছুটে আসে তার নিজের দিকেই আর সেই মুহূর্তে চরম হতাশায় নিজেকেই ধ্বংস করে ফেলার ইচ্ছে জেগে উঠতে পারে লোকটির মনে। এর ফলে হয়তো সে বেশ কয়েকটা ঘুমের বড়ি গিলে ফেললো এবং পরমুহূর্তেই সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিল তার ঘুমের বড়ি খাবার কথা। সবার দৃষ্টি আকর্ষণের এটাই

তার কাছে একমাত্র চরম পথ বলে মনে হবে। এক্ষেত্রে মনে মনে সে সব সময়ই অবশ্য আশা করে, আশেপাশের সবাই যে কোন ভাবেই হোক ওকে বাঁচাবে। অনেক সময়ই সে অবস্থায় বাঁচানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ঘটনাটা আত্মহত্যা বলে চিহ্নিত হয় তখন। তোমার বন্ধুর ক্ষেত্রেও এরকম কোনও কারণ থাকতে পারে।

অন্তু নিঃশব্দে কথাগুলি শুনে যায়। সরমাদি আবার শুরু করেন—শারীরিক যন্ত্রণাও কোন বিশেষ মুহূর্তে আত্মহত্যার উপাদান যোগাতে পারে, সে কথায় পরে আসছি।

মানসিক যন্ত্রণার কথা বলছিলাম—ভালবাসার জনকে হারানো এর মধ্যে পড়ে। এর পর যে কারণটা বড় হয়ে দেখা দেয় তা হলো—কোন বিষয়ে অকৃতকার্যতা, তা সে পরীক্ষাতেই হোক বা চাকরী পাবার ব্যাপারেই হোক। নিজের সম্বন্ধে হীন-মনোবৃত্তি বা কোন বিষয়ে সকলে কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। এছাড়া কোন বিষয়ে ক্রমাগত হতাশাও মানুষের জীবন-ধারণকে তার কাছে অর্থহীন করে তুলতে পারে। এই ক্রমাগত হতাশার পিছনে অনেক সময়ই কারণ হিসাবে থাকে শারীরিক কোন দীর্ঘস্থায়ী অসুখ বা যন্ত্রণা। সারা জীবনে পরিত্রাণের আশা নেই এমন কোন অসুখ, যেমন বিশেষ ধরণের ক্যানসার ইত্যাদি হলে রোগীর মনে আত্মহত্যার প্রবণতা জাগাটা অস্বাভাবিক নয় এবং এমনও দেখা গেছে কেউ হয়তো আত্মহত্যা করলেন এমন একটা সময়ে যার কয়েক ঘণ্টা বাদে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মারা যেতেন।

মানসিক এবং শারিরিক এই কারণগুলি ছাড়াও আত্মহত্যার পিছনে, সমাজ ও সংস্কৃতিরও প্রভাব থাকে। যেমন পশ্চিম জার্মানী, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী, আমেরিকা ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতায় পুষ্ট দেশগুলিতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে খুবই বেশি তেমনিই আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে বা আদিম উপজাতিগুলির মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা গেছে খুবই কম। পরিসংখ্যানটাও দিচ্ছি। পশ্চিম জার্মানী বা হাঙ্গেরিতে যেখানে প্রতি একলক্ষে ৩০ জন আত্মহত্যা করে—নিউগায়না বা ফিলিপাইনে সেখানে প্রতি এক লক্ষে আত্মহত্যার সংখ্যা মাত্র এক। আত্মহত্যার ওপর ধর্মের প্রভাবও যথেষ্ট আছে। যেমন, অন্য ধর্মের লোকদের তুলনায় মুসলমান বা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক কম। এক ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানীর মতে, যে সব সমাজে কোন মানুষের সঙ্গে গোটা সমাজটার সম্পর্ক বেশ জোরদার অর্থাৎ যে সব সমাজে সকলে একসঙ্গে মিলে মিশে থাকে, সেই সব সমাজে আত্মহত্যার প্রবণতা যথেষ্ট কম। ঠিক এই কারণেই গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে বা শিল্পপ্রধান জায়গায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বেশি।

আত্মহত্যার ব্যাপারে সামাজিক বাধানিষেধেরও একটা ভূমিকা আছে। আত্মহত্যার চেষ্টা প্রায় সব দেশেই আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ, তবু বিশেষ অবস্থায় সামাজিক এই বাধানিষেধের যে হেরফের হয় না তা নয়, বিশেষতঃ যুদ্ধবিগ্রহের সময় জায়গা বিশেষে আত্মহত্যা দেশপ্রেমের নিদর্শন বলেই চিহ্নিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য অনেকেই বেছে নেন আত্মহত্যার পথ। কয়েক বছর আগে আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের সময় ভিয়েতনামের রাস্তায় গনপ্রতিবাদ হিসেবে বৌদ্ধ সাধুদের আগুনের জ্বলন্ত শিখায় আত্মাহুতির কথা হয়তো শুনে থাকবে। আমাদের মতো গরীব এবং বিপুল জনসংখ্যার দেশে পয়সাকড়ির অভাবের জন্যই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বেশি। আবার এগুলি বেশি করে ঘটে সামাজিক সংকট যেমন বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির সময়ে।

আসলে ব্যাপারটা হলো, বিশেষ কোন শারীরিক এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ কিছু মানসিক অসুস্থতার মধ্যে মানুষ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা সে আশেপাশের পাঁচজনকে সরাসরি বা হাবভাবে জানাতেও চেষ্টা করে। কেউ হয়ত মদ খাবার মাত্রা অদ্ভুতভাবে বাড়িয়ে দেন। কেউ হয়ত আত্মহত্যা নিয়ে মনে মনে আলোচনা করেন, কেউ বা আত্মহত্যা সম্পর্কে নানা কথা লেখেন তাঁদের রোজনামচার খাতায় এবং সবচেয়ে বড় কথা এঁদের প্রায় সকলেই কোন না কোন অবসাদে ভোগেন—এ সবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পূর্বলক্ষণ। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, প্রায়শই এদের আচার-ব্যবহারের পরিবর্তনটা আর পাঁচজনের চোখে পড়ে না—সেই বিশেষ ঘটনাটা ঘটে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। সরাসরি হোক বা হাবভাবেই হোক, আত্মহত্যার ইচ্ছার ব্যাপারটা জানানোর উদ্দেশ্য শুধু নিজের জীবন সম্বন্ধে অনীহাই নয়, সেই সঙ্গে বিশেষ কারোর সাহায্য প্রার্থনা। বিশেষ কোন সমস্যায় সাহায্যের জন্য সেই কান্না যখন ব্যর্থ হয় তখনই আত্মহত্যার চরম সিদ্ধান্ত নেই মানুষ।

—তাই যদি হবে, আমার যে বন্ধুটি মারা গেল—আমি তো কাল বিকেলেও তার সঙ্গে এক রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি। আমার তো একবারও মনে হয়নি—ও বাড়ী গিয়েই আত্মহত্যা করবে। অন্তু বলে ওঠে।

—তুমি নিশ্চয়ই ছেলেটিকে তেমনভাবে লক্ষ্য করোনি। সরমাদি জোরালো গলায় উত্তর দেন।—যাক্ সে কথা। মানুষ যাতে আত্মহত্যা না করে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেটা বলেই এ প্রসঙ্গে ইতি টানবো।

আইন করে যে আত্মহত্যা প্রতিরোধ সম্ভব নয় তা আর কার অজানা? বহু দেশে 'আত্মহত্যা প্রতিরোধ কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে—শুধু

আমেরিকাতেই শ'-দুয়েকের বেশি এ ধরণের সেন্টার রয়েছে। মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন, মনে মনে আত্মহত্যার ইচ্ছে আছে—এমন সব লোকেরা সরাসরি বা আত্মীয়জনের মাধ্যমে এই সব কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আত্মহত্যা প্রতিরোধ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা এদের সমস্যাগুলি নিয়ে এদের সঙ্গে আলোচনা করেন, মানসিক অস্থিরতার জন্যে দায়ী ঘটনাগুলিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করেন। আমাদের দেশেও নিঃসন্দেহে এ দিকটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করা দরকার কি বলো?

অন্তু কিছু বলে ওঠার আগেই সরমাদি টেবিলের উপর রাখা বইগুলির দিকে হাত বাড়ান।

মানসিক রোগও সারে

কি অন্তুবাবু, কি ঠিক করলে ? বইখাতাগুলো টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে সরমাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

অন্তুর স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে ; এবার খোদ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। এতক্ষণ টেস্টের কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করে শেষমেশ সরমাদি জানতে চেয়েছেন—মাধ্যমিকের পর অন্তু কি নিয়ে পড়বে ?

—মাধ্যমিকের পর উচ্চ-মাধ্যমিক তো পড়তেই হবে ; অন্তু লাজুক গলায় উত্তর দেয়। তারপর জয়েন্ট এনট্রান্স। আমার সব বন্ধুরাই তো জয়েন্ট এনট্রান্স-এ বসবে। তারপর হয় ইঞ্জিনিয়ারিং নয়তো ডাক্তারী...

—বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্তার হতে তোমার খুব ইচ্ছে, তাই না ? সরমাদি মুচকি হাসেন।—ধরো, কোনও কারণে জয়েন্ট এনট্রান্সে তুমি চান্স পেলে না, তখন কি পড়বে ?

অন্তু মাথা নিচু করে বলে—তা নিয়ে কিছু ভাবিনি এখনও। তবে জয়েন্ট এনট্রান্স আমাকে পাশ করতেই হবে সরমাদি ; একেবারে না হয় দু'বার, তিনবার দেব।

সরমাদি অন্তুর মাথায় হাত রাখেন ; তারপর আস্তে আস্তে বলেন—বড় হয়ে তুমি একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হও সে তো আমরাও চাই। তুমিও আপ্রাণ চেষ্টা করবে যাতে তা হওয়ার সুযোগ পাও। কিন্তু কি জানো—ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার না হতে পারলে জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল—এমনটা মনে করারও কোন কারণ নেই। আসলে, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষাই আমাদের সারা জীবনে মেটে না ; জীবনের সাফল্যগুলির সাথে সাথে ব্যর্থতাকেও যারা হাসিমুখে মেনে নেয়...মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায়—তারাই হলেন মানসিক দিক থেকে সবচেয়ে সুস্থ।

—তাহলে 'হতাশা' থেকেই কি মানসিক রোগের সৃষ্টি হয় ? অন্তু ফস্ করে প্রশ্ন করে।

—সবগুলো না হলেও, অনেক মানসিক রোগের পেছনেই 'হতাশা' মূল কারণ হিসেবে কাজ করে। মানসিক রোগের যেমন নানান

ধরনধারন—তেমনি তাদের পেছনে থাকে নানান ধরনের কারণ।

কি সেই কারণগুলো। অন্তু আগ্রহের চোখে সরমাদির দিকে তাকায়।

সরমাদি জোরে জোরে মাথা নাড়েন।—আরে সব কারণ বলতে গেলে তা রাত কাবার হয়ে যাবে বরং মানসিক রোগগুলোর মধ্যে যার প্রকোপ সবচেয়ে বেশী সেই 'সিজোফ্রেনিয়া' রোগটার কথাই শুধু বলি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গড়পড়তা প্রতি ১০০ জনে একজন মানুষ এ রোগের শিকার।

—এ রোগের লক্ষণগুলি কি কি ? অন্তু গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—সিজোফ্রেনিয়ার রোগলক্ষণ অনেক। সাধারণতঃ এইসব রোগীদের কোনও ব্যাপারেই বিশেষ উৎসাহ থাকে না—কিছুই এদের ভাল লাগে না ; জটপাকানো চিন্তা-ভাবনায় এরা সব সময় ডুবে থাকে। এদের আবেগ-অনুভূতিগুলি ভোঁতা মেরে যায় ; নানারকম ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে থাকে এরা। এরা অলীক সব দৃশ্য দেখে, ভগবানের ডাক শুনতে পায়, খোলামেলা ঘরে বিষের গন্ধ পায়। এরা মনে করে—কেউ না কেউ এদের ক্ষতি করতে চাইছে, এদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ বলেন—সিজোফ্রেনিয়া নাকি বংশগত রোগ ; আবার আরও কারও মতে—ছোটবেলায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কাটালে এ অসুখ হতে পারে…

—প্রতিকূল পরিবেশে—মানে কি ? অন্তু সরমাদিকে থামিয়ে দেয়।

—ধরো, ছেলেবেলায় কারোর বাবা-মার একজন কিংবা দু'জনেই মারা গেলেন—সে বাবা-মার ভালবাসা ঠিকমতো পেলো না। কিংবা ধরো, বাবা-মার মধ্যে মিল নেই। দিনরাত তাঁরা ঝগড়া করেন—শিশুটির দিকে তাঁদের নজরই নেই। কিংবা, উল্টোটাও হতে পারে। বাড়ীতে হয়তো একটাই বাচ্চা রয়েছে। সবাই মিলে সবসময় তাকে মাথায় করে নাচছে ; সে যা চাইছে তা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে হাজির করা হচ্ছে—মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় এ সবই হলো প্রতিকূল পরিবেশ। এর কোনটাই শিশুটিকে মানসিক দিক থেকে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে না ; বরং তাকে বাস্তববোধশূন্য করে তোলে।

—কিন্তু আপনি যে বললেন, 'হতাশা' থেকে এ রোগের সৃষ্টি হয়।

—হ্যাঁ, তা তো হয়ই। এরকম একজন রোগীর কথা তোমাকে বলেছি—যার ধারণা, সে নাকি বিরাট পণ্ডিত, এবং যে হাসপাতালে সে রয়েছে তা নাকি আসলে একটা রাজপ্রাসাদ। পরে জানা গেছে, রোগীটির নিজের এবং তার বাড়ীর অন্যান্য সকলের খুব আশা ছিল—সে বড় হয়ে

বিরাট পণ্ডিত হবে। অনেক টাকা রোজগার করবে। ঘটনাচক্রে ছেলেটি কলেজের গণ্ডীও ডিঙ্গোতে পারে নি। ব্যর্থতার হতাশাকে ঢাকবার জন্য সে উদ্ভট সব কল্পনার আশ্রয় নেয়—সে যেন বিরাট কেউকেটা হয়ে গেছে। এটাই তো 'সিজোফ্রেনিয়া' অসুখের লক্ষণ।

—আহারে, বেচারা! মানসিক রোগীদের জন্য অন্তর কষ্ট হয়।—এরা কি ভাল হয় না সরমাদি?

—কেন হবে না। ঠিকমতো চিকিৎসা করলে অনেকেই একদম ভাল হয়ে যায়। তবে এতো আর ম্যালোরিয়া-টাইফয়েড নয় যে ওষুধ খেলেই একেবারে টপ্ করে ভাল হয়ে যাবে। জানো তো—মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য প্রথম ওষুধ তৈরী হয়েছিল আমাদের দেশেরই 'সর্পগন্ধা' গাছ থেকে।

অন্তু মাথা নাড়ে। সরমাদি বলে চলেন—সর্পগন্ধা থেকে তৈরী হয়েছিল 'রেসারপিন' নামে ওষুধ—সিজোফ্রেনিয়া রোগে ব্যবহার করে বেশ সুফল মিলেছিল। সে অবশ্য এখন থেকে প্রায় তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর আগেকার কথা। তারপর অবশ্য 'ক্লোরপ্রোমাজাইন' এবং আরও অন্যান্য ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে, সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের এখন এসব ওষুধই দেওয়া হয়। আর এসব ওষুধে কাজ হয় বলেই—মানসিক রোগীদের এখন আর দিনের পর দিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয় না।

সরমাদি একটু থেমে আবার শুরু করেন।—একদল বিজ্ঞানী বহুদিন ধরেই বলে আসছেন—মন-টন সব বাজে কথা, মানসিক রোগ নাকি আসলে শরীরের জীবরাসায়নিক পরিবর্তনের জন্যেই হয়ে থাকে। তা না হলে ওষুধ খেলে কি করে মনের অসুখ সারে? ওদের কথাগুলির মধ্যে যে যুক্তি আছে তার জবরদস্ত প্রমাণও মিলেছে কিছুদিন আগে। তোমাকে একটু আগে ক্লোরপ্রোমাজাইন-এর কথা বলছিলাম। সিজোফ্রেনিয়া রোগের উপশমের জন্য ঐ ধরনের যেসব ওষুধ এযাবৎ বেরিয়েছে, দেখা গেছে—তাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যার বলে তারা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যেকার 'ডোপামাইন' নামে একটা বিশেষ রাসায়নিকের কাজকর্মকে বাধা দিতে পারে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন—যখন কোনও মানুষের মস্তিষ্কে 'ডোপামাইন' বেশীমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে তখনই মানুষটি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। পরে দেখা গেল—'ডোপামাইন' বেশীমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে আমাদের শরীরের মধ্যে 'প্রোলাকটিন' নামে এক হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। অর্থাৎ, শরীরে প্রোলাকটিনের মাত্রা যদি বাড়ানো যায় তবে ডোপামাইনের সক্রিয়তা কমে ; এবং সিজোফ্রেনিয়া রোগটাও সারে।

এরপর বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন—প্রোলাকটিন-হরমোন আমাদের শরীরে 'প্রোস্টাগ্ল্যানডিন-ই-১' নামে অম্লজাতীয় এক জৈবযৌগ তৈরীতে সাহায্য করে। সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের শরীরে এই প্রোস্টাগ্ল্যানডিনের মাত্রা সত্যিই যে কম থাকে তার প্রমাণ ঃ সিজোফ্রেনিয়া রোগীরা কখনও আর্থ্রাইটিসে ভোগে না। শরীরে প্রোস্টাগ্ল্যানডিনের মাত্রা বেশী থাকলে যে আর্থ্রাইটিস হয় সেটা এখন সবার জানা।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের যন্ত্রণাবোধটা অন্যদের তুলনায় অনেক কম। এমনও দেখা গেছে, কোনও সিজোফ্রেনিয়া রোগীর হয়তো হাড়গোড় ভেঙ্গে গেছে কিংবা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ হয়েছে—কিন্তু তার চোখে মুখে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই। আবার জ্বরজারী হলে সিজোফ্রেনিয়া রোগীরা সাময়িকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানীদের মতে—প্রোস্টাগ্ল্যানডিনের মাত্রা কম থাকে বলেই সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের যন্ত্রণাবোধটা কম। আবার জ্বরের সময় শরীরে প্রোস্টাগ্ল্যানডিনের মাত্রা বেড়ে যায় বলে রোগটাও অল্প সময়ের জন্য চাপা পড়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—জন্মান্ধ মানুষরা কখনই সিজোফ্রেনিয়ার মতো মানসিক রোগে ভোগেন না। জন্মান্ধ মানুষদের শরীরে প্রোস্টাগ্ল্যানডিনের মাত্রা বেশী থাকার জন্যই এমনটা হয়ে থাকে।

সরমাদি থামতেই অন্তু বলে উঠলো—কি কারণে মানসিক রোগ হচ্ছে তা নিয়ে অত মাথা না ঘামিয়ে, বরং সিজোফ্রেনিয়ার মত অসুখে যারা ভুগছে তাদের শরীরে খানিকটা করে প্রোস্টাগ্ল্যানডিন ঢুকিয়ে দিলে তো কেল্লা ফতে। মানসিক রোগীদের অসুস্থতা তো সব এক নিমেষে হাওয়া হয়ে যাবে!

সরমাদি হেসে বলেন—সেই দিন বোধহয় আসতে আর বেশী দেরী নেই অন্তু। তবে ব্যাপারটা যত সহজে ভাবছো কে জানে কার্যক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে এত 'সহজ ফর্মুলা' দিয়ে সিজোফ্রেনিয়া পুরোপুরি সারানো সম্ভব হচ্ছে না!